বিদ্যালয়সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব, ২০১১

বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নভেম্বর- ২০১১

মুখবন্ধ

বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিজেদের মধ্যে পরস্পর মত বিনিময় করে মতৈক্যের ভিত্তিতে এই প্রস্তাব-পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। কাজটি সমাপ্ত করতে আরও অনেকেরই অক্লান্ত শ্রম ও অমূল্য অবদান রয়েছে । ফলে সময়মত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির খসড়াটি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া গেছে। কমিটি গণতান্ত্রিক পথে সব সদস্যের মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, প্রারম্ভিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথার অবসানকে কেন্দ্র করে আমার নিজেরই একটি Note of Dissent এই বিবরণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ।

সমগ্র বিবরণসহ খসড়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিটি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার জন্য শিক্ষাদপ্তরের Website এ তুলে দেওয়া হল । আমার মতামতের সঙ্গে যারা একমত তাঁরাও তাঁদের প্রতিক্রিয়া পাঠাতে পারবেন । আগামী একমাস এই Website টি খোলা থাকবে প্রতিক্রিয়াগুলি গ্রহণ করার জন্য । তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই আমাদের এই খসড়া বিবরণীটিকে চূড়ান্ত করা হবে ।

ধন্যবাদান্তে

নি বেদিতা ভবন

১৮ নভেম্বর ২০১১

(অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল)

সভাপতি

বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক

বিশেষজ্ঞ কমিটি

মর্মার্থ সংক্ষেপ

(Executive Summary)

নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পরেই ২০১১ সালে জুলাই মাসে একটি বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন । এই কমিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে তিনটি বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

1) জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুসারে প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন কৌশল খতিয়ে দেখা ।
2) বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিস্থিতি কি তা বিচার করা ।
3) উপরের দুটি দলিল বিবেচনা করে এমন কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করা যাতে শিশুরা চাপ মুক্ত হয়ে আনন্দের সাথে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারে এবং স্মৃতি –নির্ভরতা কাটিয়ে বোধ ও প্রয়োগ সামর্থ্যে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে ।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আটটি ক্ষেত্রে কমিটিকে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে –

i) প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমান পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে কতখানি কার্যকরী তা সম্পর্কে সুপারিশ।
ii) বর্তমানে চালু মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ ।
iii) পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীলতা ও অত্যাধিক স্মৃতি-নির্ভরতা সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ ।
iv) প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরতা সম্পর্কে সুপারিশ ।
v) বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে সুপারিশ ।
vi) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সুপারিশ ।
vii) বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সুপারিশ ।
viii) বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সুপারিশ ।

এছাড়া কমিটি নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির রূপায়ণ করতে যে প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রয়োজন তা নিয়েও সুপারিশ করেছেন এই বিবরণীতে । গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে সমস্ত প্রস্তাব ও সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তাও তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন এবং বর্তমানে যে সমস্ত কর্মনির্ভর (Activity- based) শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কাজ আজও কলকাতা বা তার আশেপাশে দেখা যায় তাও তাঁরা দেখে এসেছেন ।

এরই ভিত্তিতে উপরিউক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে । এখানে দুটি অংশে এই সুপারিশগুলিকে ভাগ করা হয়েছে–

1) পাঠক্রমে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ।
2) শিক্ষা প্রশাসনে কিছু পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ ।

পাঠক্রমে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ১৪টি বিষয়বস্তু আনা হয়েছে–

১. শিশুর মর্যাদা ও অধিকার ।

২. বিদ্যালয়ে মিশ্র সংস্কৃতি ।

৩. শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণ ।

৪. সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ।

৫. বাজার অর্থনীতি ও মানুষের প্রত্যাশা ।

৬. পরিবেশ শিক্ষা ।

৭. পরীক্ষা পদ্ধতি ও আটকে না রাখার নীতি ।

৮. বাড়ির কাজ ও প্রাইভেট টিউশন ।

৯. শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ।

১০. শিখন মান ও তথাকথিত পিছিয়ে-পড়া শিশুদের সমস্যা ।

১১. নতুন কিছু সুপারিশ –

ক) স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা ও কর্মমূলক ও শিল্পকলার চর্চা।

খ) ত্রিভাষা সূত্র ।

গ) সমকালীন বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্তি ।

১২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ।

১৩. বিদ্যালয় ও শ্রেনীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ ও কার্যকরী কৃত্যসূচি নির্বাচন ।

১৪. পাঠ্যসূচি / কৃত্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ।

অন্যদিকে নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি রূপায়ণ করতে শিক্ষা প্রশাসনে কিছু পরিবর্তনের কথাও সুপারিশ করা হয়েছে।

- বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর করতে ৩ বছরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ পরিকাঠামো নির্মান এবং শিখন সম্ভার প্রকাশ শেষ করা।
- চক্রসম্পদ কেন্দ্রগুলিকে আকারে ছোট করে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গড়ে তোলা ।
- Academic Authority হিসাবে বিদ্যালয় স্তর থেকে রাজ্য পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ।
- School Development Plan গুলির সমন্বয়ে চক্র, ব্লক, জেলাস্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা নির্মান ।
- প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও ক্ষমতাবৃদ্ধিসহ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের গুরুত্ব বাড়ানো ।
- ৬ বছরে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি এবং অন্ততঃ এক বছরের জন্য প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ।

এই বিবরনীর শেষ অংশে বিষয় ভিত্তিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছেঃ

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য সুসংহত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ।

খ) তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় ভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি ও স্বাস্থ্য-শরীরশিক্ষা ও সৃজনমূলক কৃত্যালির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ।

গ) ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাষা ও গণিতসহ সুসংহত বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভুগোল ও স্বাস্থ্য-শরীরশিক্ষা ও সৃজনমূলক কৃত্যালির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ।

ঘ) নবম ও দশম শ্রেণির জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাষা ও গণিতসহ জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্য, শরীরশিক্ষা ও সৃজনমূলক কৃত্যালির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি।

এই পর্যায়ে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি হল :

বিশেষ বিশেষ সুপারিশ

1. প্রতিটি শিশুরই যথেষ্ট সামর্থ্য আছে এই সত্যটির উপর আস্থা রেখে প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণিতে শিশুর সামর্থ্য মানচিত্র (Competency mapping) তৈরি করতে হবে। এই মানচিত্র নির্মাণের প্রকৌশল তৈরি করার জন্য রাজ্য থেকে চক্রস্তর পর্যন্ত দল তৈরি করে এব্যাপারে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (১১.১ এবং ১২.১)
2. শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে ফলাফলের সমতা (equality of outcome) কে হতিয়ার করতে হবে। এলাকার বৈচিত্র্য ও শিশুদের সামর্থ্যের তারতম্যকে মাথায় রেখে প্রতিটি বিষয়েই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের জন্য ফাঁকা অংশ (open space) রেখে দেওয়া হয়েছে। ঐ অংশটির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় পাঠক্রম রচনা করতে হবে এবং শিশুদের শিখনে তার সংযোজন ঘটাতে হবে । স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও উৎসবের বিভিন্নতাকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দিয়ে সেগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে হবে প্রতিদিনকার কৃত্য ও পাঠ্যসূচির মধ্যে। (১.২.১ এবং ১.৩.১)
3. আলাদাভাবে 'পরিবেশ বিদ্যা'র নামে কোনো পাঠ্যপুস্তক চালু না করে প্রাথমিকস্তরে একটিমাত্র 'পরিবেশ পরিচয়' নামে বিষয় প্রচলন করতে হবে । এই বিষয়টির মধ্যেই বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাস সুসংহত (Integrated) ভাবে সম্বন্ধযুক্ত থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'পরিবেশ' কোনো আলাদা বিষয় হিসাবে থাকবে না বরং ভাষাচর্চার অঙ্গ হিসাবে পরিবেশের পাঠগুলিকে একটিমাত্র 'শিখন-সম্ভার' এর মধ্যেই সুসংহত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্তও আলাদা 'পরিবেশ বিদ্যার' পরিবর্তে পরিবেশ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ভূগোল, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে । নবম ও দশম শ্রেণিতে একইভাবে পরিবেশ বিদ্যায় আলাদা কোনো পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার অর্থ নেই বলে কমিটি মনে করেন। (১.৪.১)
4. বাজার অর্থনীতি ও তীব্র প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে নম্বর তোলার 'ইঁদুর দৌড়' থেকে মুক্ত করে শিশুদের আনন্দ ও ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করতে এবং তাদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করাতে হবে। তাই,তার জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে খুঁটিনাটি তথ্যের ভার কমিয়ে ধারণা তৈরির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ।ব্যক্তিগত সাফল্য বড় করে না দেখে দলগত প্রতিযোগিতা ও সাফল্যকে মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে । অসফলদের জন্য পরিকল্পনামাফিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। সফল শিশুদের আরও বেশি করে সামাজিকভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । প্রতিটি শিশুর মধ্যেই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সামর্থ্য আছে তা মূল্যায়ন করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের পাঠক্রম চর্চার মধ্যে যত বেশি সম্ভব যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। (১.৫.১, ১.৪.১ এবং ১.৫.৮)
5. পাঠক্রমে মূল্যবোধের শিক্ষায় শিশুকে নীরস নীতি শিক্ষার পরিবর্তে কৃত্যালির মাধ্যমে ভাল-মন্দ বিচারবোধ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস, সংগীত, নাটক, চিত্রাঙ্কন বিতর্ক, গ্রাম সমীক্ষার মাধ্যমে নন্দনশিল্প ও সমাজভাবনার প্রতি আকর্ষণ এবং বিজ্ঞান মনস্কতা, কুসংস্কার বিরোধী মনোভাব, বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্বশৃঙ্খলা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, সহনশীলতা ও শান্তিপ্রিয়তা, সর্বোপরি সব কাজে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যক্রমে অজস্র পাঠ ও কৃত্যালি পরিকল্পিত ভাবে দেওয়ার সুপারিশ

করা হয়েছে। শিশুর মূল্যায়নে এই বিষয়টির বিচার করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে । (১.৬.৪. এবং ১.৬.৫.)

6. আটকে না রাখা এবং পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হচ্ছেঃ প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আটকে না রাখার নীতি গ্রহণযোগ্য।পঞ্চম শ্রেণিতে এটির প্রয়োগ ২০১৩ সাল থেকে করা যেতে পারে তবে আগামী বছরের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়কে RTE অনুসারে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত, শ্রেণিকক্ষ এবং নতুন পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
   - উচ্চপ্রাথমিকে আপাতত এই উদ্যোগ বন্ধ রেখে ২০১৪ সাল থেকে ধাপে ধাপে ২০১৬ সালে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা যেতে পারে। তবে শর্ত হিসাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং পঠন-পাঠন সম্ভার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । যতদিন না তা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন চালু প্রথা ভাঙার প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করছেন না।
   - প্রাথমিকে সঠিকভাবে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CCE) প্রচলন করা প্রয়োজন ঐ বছর থেকেই।এই ধাপে ধাপে সার্বিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন চালু করতে হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত।উচ্চপ্রাথমিক প্রচলিত 'ইউনিট তেস্ত'নামক পরীক্ষা পদ্ধতি বন্ধ রাখাই শ্রেয়।
   - তার পরিবর্তে প্রতি শ্রেণিতে দুটি পার্বিক এবং একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন থাকবে ।শুধু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নয়, নবম শ্রেণিতেও এই পদ্ধতি চালু করতে হবে।
   - দশম শ্রেণির শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা রাখা যেতে পারে।
   - নবম-দশম বিভাজিত পাঠ্যক্রম হবে। নবম শ্রেণিতেও সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।
   - Grade Point Average পদ্ধতি সঠিকভাবে চালু না করা গেলে পুরনো নম্বর পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনা উচিত বলে মনে করেন কমিটি।
   - সার্বিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি শিশুর জন্য Report card তৈরি হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি 'ডায়েরি' রাখবেন শিশুদের অগ্রগতি এবং ঘাটতির বিবরণ নথিবদ্ধ করতে।
   - কোনো মূল্যায়নের অভীক্ষাপত্র হুবহু পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে রচিত হবে । শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষানিরীক্ষা করে যেভাবে পঠন-পাঠন চলবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঐ অভীক্ষাপত্র নির্মিত হবে।
   - মুখস্ত করে পরীক্ষায় বসার ধারা বর্জন করতে হবে।
   - ইংরাজিতে শোনা-বলা ও কথোপকথনে জোর দিতে বলা হয়েছে।
   - বিভিন্ন বিষয়ে Project Work, স্বাস্থ্যচর্চা,সৃজনমূলক ও সেবামূলক কর্মসূচির জন্য ২০% নম্বর মাধ্যমিকেও যুক্ত হবে।
   - দশম শ্রেণি পর্যন্ত তৃতীয় ভাষার পরীক্ষার জন্য স্থানীয় স্তরে পরীক্ষা মণ্ডলী থাকবে, তবে তার ফলাফল সামগ্রিক নম্বরে যুক্ত হবে না।
   - মেধাঅন্বেষণের জন্য চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণি বা অষ্টম শ্রেণির পর কোনো সমীক্ষা হ'লে তাতে কমিটির কোনো অমত নেই।

7. স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চাটিকে ষষ্ট থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন করে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন সহ ফিল্ম স্টাডি, অভিনয়,সাংবাদিকতা, গ্রামসেবা সহ বিভিন্ন বৃত্তির চর্চা সম্পর্কে ধারণা করতে একদিকে যেমন 'practical activities' থাকবে তেমনি Theoritical part ও থাকবে। স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রও তাই । এক্ষেত্রে শতকরা ৪০ নম্বর Therotical এবং ৬০ নম্বর practical এ ধার্য করা হয়েছে । প্রাথমিকে এই বিষয়টি সুসংহত

(Integrated)র সুপারিশ করা পদ্ধতিতে অন্য বিষয়ের সঙ্গে চর্চা হলেও পাঠক্রমে সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কিছু ব্যবহারিক দিক যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে । উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিকেও ছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক অবস্থা ও তাদের পুষ্টিকেও পাঠক্রমের চর্চায় স্থান দিতে সুপারিশ করা হয়েছে । এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথাও বলা আছে।

8. ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত 'ত্রিভাষা' সূত্র চর্চার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূলতঃ সংবিধান স্বীকৃত প্রচলিত ভারতীয় ভাষার চর্চা বাড়াতে এই পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে । নবম-দশম শ্রেণিতে তা আবশ্যিক হ'লেও মোট নম্বরে এই বিষয়ের ফলাফল যুক্ত না করার সুপারিশ করা হয়েছে।

9. পাঠক্রমটিকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন পাঠ আনা হয়েছে । প্রতিটি শ্রেণিতেই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে শিশুদের জন্য যথেষ্ট খোলা পরিসর (open space) রাখা হয়েছে যা স্থানীয় এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে শিক্ষককেই । অন্যদিকে এমন অনেক নতুন প্রাসঙ্গিক বিষয়ভাবনা আনা হয়েছে যা শিশুদের কাছে কৃত্যালির মধ্যদিয়ে সহজেই উপস্থাপনা করা যায় । যেমন লিঙ্গবৈষম্য ও তার সমস্যা, পঞ্চায়েতিরাজের ইতিহাস ও তার বর্তমান পরিস্থিতি, বর্তমান বাজার ও তার সুফলকুফল, মিডিয়ার ভূমিকা, ক্রিকেটের ইতিহাস, ফিল্ম স্টাডি , গ্রাম সমীক্ষা ও গ্রাম সংগঠন ইত্যাদি ।

10. শিক্ষা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়েছেঃ
    - B.Ed, B.P.Ed, P.T.T.I , D.El.Ed কোর্সের পাঠক্রমে সামঞ্জস্য আনার ব্যবস্থা এবং নয়া পাঠক্রম অনুসারে ঐ কোর্সগুলির পাঠ্যসূচিতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে কমিটি সুপারিশ করেছেন।
    - জেলাস্তরে DIET কে শক্তিশালী করে এই প্রশিক্ষণের পুরো দায়িত্ব তাদের ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ।
    - প্রশিক্ষণে ICT ও Video conferencing এর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে বিদ্যালয় চলাকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া ।
    - চক্রসম্পদ কেন্দ্রগুলিকে (CLRC) এজন্য আরও ক্ষমতায়িত করা এবং প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত শিক্ষকদের এই কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা ।
    - SCERT কে এই কাজের জন্য Academic Authority হিসাবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ।

11. শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়েছেঃ
    - প্রতিটি শ্রেণি বা শ্রেণিবিভাগের জন্য সরকারকে একটি করে উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ এবং একজন করে শিক্ষক উচ্চ-প্রাথমিক পর্যন্ত সুনিশ্চিত করতে হবে সরকারকে আগামী ৩ বছরের মধ্যেই।
    - দলগত পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগামী শিক্ষাবর্ষ(২০১২)থেকেই
    - দলগত পাঠ-পরিকল্পনা নির্মাণের জন্য এবং তা শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রধানশিক্ষক ও স্থানীয় S.I. of school কে দায়িত্ব নিতে হবে। এর জন্য প্রধানশিক্ষক ও স্থানীয় S.I. of schoolকে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ।
    - শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় ক্ষেত্রবিশেষে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্মাণ করা ও পরিবর্তন করার স্বাধীনতা থাকবে শিক্ষকদের। ফলাফলের ক্ষেত্রে অভীষ্ঠ লক্ষমাত্রা ধার্য করা আছে তা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের নিজের মত পরিকল্পনা নিতে হবে।
    - পঠন-পাঠনে পাঠ্যপুস্তককে একমাত্র শিখনসম্ভার নামে একটি নতুন পাঠসামগ্রী তৈরির সুপারিশ করেছেন এই কমিটি ।

- সুসংহতভাবে প্রাথমিকে একটি এবং উচ্চ-প্রাথমিকে আর একটি পাঠ-সামগ্রী নির্মাণ করতে হবে সরকারকেই।যা একসঙ্গে চারটি শ্রেণির সামর্থ্যকে মাথায় রেখে এটি রচিত হবে এবং একইসঙ্গে পিছিয়ে পড়া ও উন্নতমানের শিক্ষার্থীদের মান অনুসারে কৃত্যালি নির্বাচনে এটি সাহায্য করে এবং দ্রুত পিছিয়ে পড়াদের শ্রেণির স্বাভাবিক গতিতে ফিরিয়ে আনতে ও সাহায্য করবে । এছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত পুস্তক, অন্যান্য শিখন সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে।
- লেখার সামর্থ্য নির্মাণে অভিনব প্রক্রিয়ায় প্রকল্প তৈরি করে জোর দিতে হবে।
- পাঠ-পরিকল্পনা, শিখন সামগ্রী নির্মাণ, অভীক্ষাপত্র নির্মাণ , Report Card তৈরি, CLRC কে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ , অভিভাবকদের সঙ্গে সভা, পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা , স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ , প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে কাজ, বাড়ির কাজের নমুনা তৈরি সর্বোপরি পাঠগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে কিছুটা সময় শিক্ষককে ব্যয় করতেই হবে। এই সময়টুকু ব্যবহারের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জরুরি বলে কমিটি মনে করেন।
- বিজ্ঞানের পাঠক্রমটি যেহেতু অনেকাংশে কৃত্যালি-নির্ভর হতে চলেছে তাই দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই সুসংহত (Integrated) বীক্ষণাগার নির্মানের সুপারিশ করা হয়েছে । বীক্ষণাগারের ব্যবহার আবশ্যিক করতে হবে ।
- এছাড়াও বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে 'শিখন-তবিল'(learning corner) তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে । উচ্চ-প্রাথমিকে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই এই 'শিখন তবিল' নির্মাণ করলে ভালো হবে ।
- সর্বোপরি হাতে-নাতে কাজ(Activity based learning) ও শিখনের ভাবনা মাথায় রেখে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করতে হবে ।

12. প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ২২ থেকে কমিয়ে ১৪ করার সুপারিশ করা হয়েছে । প্রথম শ্রেণিতে ৪ টির পরিবর্তে ১ টি, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪ টির পরিবর্তে ১ টি এবং তৃতীয় , চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ১৪ টির পরিবর্তে ১২ টি পাঠ্যপুস্তকের সুপারিশ করা হয়েছে । নিম্নলিখিতভাবে ঐ পাঠ্য পুস্তকগুলির রচনা ও নির্মাণের কথা বলা হয়েছেঃ
    - প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভাষা শিখনের সঙ্গে সংযোগ রেখে দ্বিতীয় ভাষা সহ গণিত ও পরিবেশ পরিচিতির বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করা যেতে পারে একটি করে শিখন সম্ভারের মধ্য দিয়ে । এই সম্ভারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'সহজপাঠ'কে সমগ্র পরিকল্পনায় সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে ।
    - তৃতীয় , চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির প্রতিটিতে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও গণিতের পৃথক পাঠ্যপুস্তকসহ বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসকে সুসংহত করে একটি 'পরিবেশ পরিচিতি ' নামে পাঠ্যপুস্তকের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
    - পাঠ্যপুস্তকে খুঁটিনাটি তথ্যের ভার কমিয়ে শিশুদের ধারণা সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে,যাতে স্মৃতি-নির্ভরতা কমিয়ে শিশুরা বোধ ও প্রয়োগের সামর্থ্য গড়ে তুলতে পারে।
    - বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনকে যুক্ত করে এই পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে । গণিত সহ সব বিষয়েই যে কোনো সমস্যার প্রেক্ষাপট হিসাবে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে শিশুকে সমস্যার প্রকৃতি এবং তা সমাধানের পথ নিজেকেই আবিষ্কারের সুযোগ দিতে হবে । তাই পাঠ্যপুস্তকগুলি হবে কর্মনির্ভর (Activity based)
    - প্রাথমিকের সমস্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার আগে একটি নির্দিষ্ট শব্দ ভান্ডার তৈরি করে তবেই এই সামগ্রীগুলি রচনা করা প্রয়োজন।

- ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা , তৃতীয় ভাষা ও গণিত ছাড়াও পরিবেশ বিদ্যার অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক সরকারকেই করতে হবে । অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষাসহ সৃজনমূলক শিক্ষার জন্য যে বিষয়টি এই স্তরে নতুনভাবে প্রচলনের সুপারিশ করা হয়েছে, সেখানে ৪০ শতাংশ থাকবে Theoretical Part । এই অংশের জন্যও পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করতে হবে সরকারকে ।
- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা ও প্রকাশনার জন্য একটি State Textbook Board গঠন করতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তকগুলির মান নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হবে । প্রতিটি বিষয়ের লেখকদের সঙ্গে একজন করে শিশু সাহিত্যিক , চিত্রশিল্পী ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাখার সুপারিশ করা হয়েছে । পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সহযোগী শিখন সম্ভারসহ বিভিন্ন শিখনসামগ্রীও তারা নির্মাণ করবেন ।
- পাঠ্যবই গুলি হবে আকর্ষণীয় , চারটি রঙ সম্বলিত এবং ভালো কাগজে ছাপা, প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিশুদের জন্য অনেকটা অংশ ফাঁকা রাখতে হবে। প্রামাণ্য ছবির ব্যবহার করতে হবে ।

13. নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সফলভাবে রূপায়ণ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে
    - ২০১৪ সালের মধ্যেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারকে শিক্ষক নিয়োগসহ পরিকাঠামো ও বিনামূল্যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে ।
    - বেশিসংখ্যায় শিক্ষার্থী আছে এমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একাধিক ইউনিটে ভেঙে পৃথক প্রশাসনের অধীনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে ।এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা সর্বশিক্ষা অভিযান এর পক্ষ থেকে করতে হবে ।
    - School Mapping সহ 'প্রোজেক্ট দীপঙ্কর'এর কাজ আগামী ১ বছরের মধ্যে সমস্ত জেলায় শেষ করতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে তা পরিমার্জন (Update) করে যেতে হবে ।
    - প্রতি চক্রসম্পদ কেন্দ্র (CLRC) হবে মোটামুটি ৫ টি বিদ্যালয় নিয়ে । প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়কেই এই কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে আসতে হবে । প্রতিটি চক্রসম্পদ কেন্দ্রে একটি করে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গড়ে তুলতে হবে । এর নেতৃত্বে থাকবেন একজন করে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক(SI/S) । এই বিদ্যালয় গুচ্ছে নিযুক্ত করতে হবে অন্তত ৫ জন কর্মরত শিক্ষককে যাঁরা কয়েক বছরের জন্য 'বিশেষ কাজের দায়িত্ব' নিয়ে কাজ করবেন । এই কারণে সাময়িক ভাবে খালি পদ গুলিতে Deputation এ শিক্ষক নিয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হ্রাস পাবেনা । পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ২ বছরের জন্য এই কাজ গ্রহণ করা যেতে পারে।
    - প্রতিটি বিদ্যালয়ে তৈরি করতে হবে School Development Plan (SDP) । স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ সামনে রেখে এই পরিকল্পনা থেকে গড়ে উঠবে চক্রসম্পদকেন্দ্রের শিক্ষা পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনাগুলির একটি অংশ সর্বশিক্ষা অভিযান ও RTE'র রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট হবে । বাকিটি নন-প্ল্যান ও প্ল্যান বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হবে ।
    - প্রাথমিক , উচ্চপ্রাথমিক , মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব আরও বাড়াতে হবে। বিদ্যালয়স্তরে তাঁদের Academic Head হিসাবে ঘোষণা করতে হবে । চক্রসম্পদকেন্দ্রে একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (SI/S) , ব্লকস্তরে সহ-পরিদর্শক এবং জেলাস্তরে একজন জেলা পরিদর্শক(অ্যাকাডেমিক) কে Academic Authority Head হিসাবে ঘোষণা করতে হবে । জেলাস্তরে যুক্ত করতে হবে DIET কে সমস্ত সারস্বত কৃত্যালির মূল সংগঠক হিসাবে । রাজ্যস্তরে SCERT কে Academic Authority হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে যাঁরা বিদ্যালয়শিক্ষা অধিকর্তা(DSE)

করণের RTE'র রূপায়ণ , পরিদর্শন এবং মানোন্নয়নের বিষয়গুলি দেখভাল করেন তাঁদের SCERT'র সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ।এই রাজ্যস্তরের দলটি পরিকল্পনা নির্মাণ, পরিদর্শন , গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন ।একজন যুগ্ম অধিকর্তাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে ।

- প্রধান শিক্ষক নিয়োগের শর্তে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা দরকার যাতে যে সমস্ত শিক্ষকেরা নয়া পাঠক্রম অনুসারে বিদ্যালয়স্তরে অথবা যে সমস্ত Resource teacher রা চক্রসম্পদকেন্দ্রে নিরন্তর গবেষণামূলক কাজ করছেন , তাঁরা বেশি সুযোগ পেতে পারেন।
- অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (SI/S) পদের নিয়োগেও বিদ্যলয়ে চাকুরীর অভিজ্ঞতা এই ধরনের কাজের সাফল্যকে যুক্ত করতে হবে ।
- জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (SIS) পদের উপরিউক্ত কাজে সফল প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- DIET এবং বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয় পরিদর্শক পদগুলিকে Common Cadre System –এ নিয়ে এলে ব্যবস্থাপনার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হবে বলে কমিটি মনে করেন।

14. সংবিধান ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ মেনে ৬ বছর বয়স থেকে প্রাথমিকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বয়স স্থির করার সুপারিশ করেছেন এই কমিটি । তাই পাশাপাশি ৬ বছরের নীচের শিশুদের জন্য প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন । এই ব্যবস্থাপনা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অথবা শিক্ষা দপ্তরের অধীনে হতে পারে বলে কমিটি মনে করেন।
15. ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সারা রাজ্যে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করেন এই কমিটি । এই প্রকল্পটিতে নয়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির কিছু অংশ নিয়ে, বিদ্যালয় গুচ্ছের মাধ্যমে কোনো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ভাবনার রূপায়ণ করতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সহযোগী শিখন সম্ভার রচনারও উদ্যোগ নিতে হবে । সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থ সাহায্যে এই প্রকল্প জেলায় অন্ততঃ একটি চক্রসম্পদকেন্দ্রের অধীনে একটি পঞ্চায়েতে করতে হবে। এটি ছয় মাসের জন্য অনুষ্ঠিত করা দরকার । SCERT এবং DIET গুলিকেও একই ছাতার তলায় এনে একটি ক্রিয়াশীল কার্যক্রম তৈরি করতে হবে ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১২
২.	কেন সংশোধনের প্রয়োজন হল	১৩
৩.	পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তনের সুপারিশ	২৩
৪.	খসড়া পাঠক্রমের রূপরেখা	৬২
৫.	খসড়া পাঠ্যসূচি	১১০

ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলিত আছে সেটি প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে শান্তিনিকেতনের বিনয়ভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী হিমাংশুবিমল মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্য সরকার নিযুক্ত একটি শিক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে। এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি গ্রহণ করে রাজ্য সরকার ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করেন। এই দলিলটিতে পঠন-পাঠন বিষয়ক কাজকর্ম ছাড়াও খেলাধূলা, শরীরচর্চা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক এবং সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজকর্মের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও প্রথম ভাষা শেখানোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় দ্বিতীয় ভাষার চর্চাটিকে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের বাইরে রাখা হয়। প্রথম শ্রেণিতে বর্ণপরিচয়ের প্রক্রিয়াটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত প্রণালীর সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়াসও দেখা গেছে। ফলত পাঠ্যসূচিতে বিদ্যাসাগরীয় পদ্ধতি এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' এর অন্তর্ভুক্তিও রদ করে 'কিশলয়' নামে নতুন পাঠ্যবই এর প্রচলন করা হয়েছে। ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার বদলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রচলিত হয়। এর পরে অবশ্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সুপারিশ মেনে মূলধারাটির কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। যেমন দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে। সহজপাঠকে আবারও পাঠ্য করা হয়েছিল 'কিশলয়' এর পাশাপাশি। মূল্যবোধের শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার কথা লেখা আছে এ দলিলটিতে। ১৯৫০ সালের পর এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। শুধু তাই নয়, পাঠক্রমটিকে সামনে রেখে একটি বিস্তৃত কৃত্য ও পাঠ্যসূচি তৈরি হয়েছিল। সেখানে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ এবং এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারে সবিস্তার সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার নিরিখে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি শ্রেণির কাম্য সামর্থ্যকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ে প্রান্তিক সামর্থ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাথে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এগুলি কীভাবে শেখাবেন তার প্রক্রিয়া ও কৌশলও সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তীকালে পাঠক্রম সংশোধনের সময়ে (২০০৩) ১৯৯৬ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে জ্যাক ডেলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভ নির্দেশ করেছিলেন তা গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য দলিলটির ভিত্তিতে মূল্যায়নপদ্ধতিতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। চালু হয়েছে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত আটকে না রাখার ব্যবস্থা। বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নকে সামর্থ্যভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়নকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে প্রথম দুটিতে পার্বিক মূল্যায়ন এবং শেষটিতে সামগ্রিক মূল্যায়নেরও সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি পাঠ-একক এর শেষে এবং পাঠ চলাকালীন তাৎক্ষণিক ও একক ভিত্তিক মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির শেষে শিশুদের মান নির্ধারক বহিঃমূল্যায়নেরও ব্যবস্থা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য সংশোধনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের পৃথক পৃথক মূল্যায়ন করে যথাযোগ্য নথি সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। মূল দলিলটিকে ২০০৩ সালে পুনরায় নবীকরণ করা হয়। উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ২০০৬ সালে 'নতুন পাঠক্রম' নাম দিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু দেখা গেছে ওটি কোনো পাঠক্রমের রূপরেখা নয়, বরং কিছু পাঠ্যসূচি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত এই 'নতুন পাঠক্রম' পুস্তিকায় বিভিন্ন বিষয়ে কি কি বিষয়বস্তু পড়ানো হবে তা এখানে উল্লিখিত রয়েছে।

তা হলে আবার সংশোধনের প্রয়োজন কোথায় ?

বিগত ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষাক্রমের এই মূলধারাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হলেও জাতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের মান আশাব্যঞ্জক নয়। গত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষা-উন্নয়ন সূচক Education Development India (EDI) এর পরিমাপে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩২/৩৩ এ অবস্থান করেছে। এ বছর প্রাথমিকের ক্ষেত্রে অবশ্য তা কমে ২৪-এ এসেছে। এযাবৎ যতগুলি শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ সংস্থা সমীক্ষা করেছেন তাঁদের প্রতিটিতেই শিশুর শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকারিতা ভীষণভাবেই হ্রাস পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। IIM-কলকাতা শিক্ষা প্রশাসন নিয়ে যে সমীক্ষা করছে, তার প্রাথমিক বিবরণীতে পরিদর্শনের গুণগত মানের অবনয়ন এবং পরিদর্শকদের শুধু নন- অ্যাকাডেমিক কাজে নিযুক্ত রাখার পরিস্থিতিকে সমালোচনা করা হয়েছে। পরিকাঠামো নির্মাণেও অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে। EDI ranking থেকে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। পাঠক্রমের মূল সুপারিশগুলি কার্যকর করতে গেলে বিদ্যালয়স্তরে যোগ্য নজরদারি ও সাহায্য

প্রয়োজন তা কার্যকর করতে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা যে অনেকাংশেই অক্ষম তা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু কয়েকটি রিপোর্টে এও দেখা গেছে যে মূল্যায়নের পরিবর্তে বিদ্যালয়ে তিনটি পরীক্ষা চালু হয়ে গেছে। এর প্রভাবে পঠন-পাঠনে মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ও ছাপানো প্রশ্নপত্র কিনে এনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করছেন। ফলে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন আসলে কথার কথাই থেকে গেছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আচরণ, শিশুদের প্রতি তাদের যত্ন, স্নেহ, সার্বিক সহনশীলতার ক্ষেত্রেও অনেক প্রশ্ন উঠছে। সম্প্রতি শিশুদের মানসিক ও দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহামান্য উচ্চ-আদালতকে কড়া রায় পেশ করতে হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও তার জন্য সারা রাজ্যে সাধারণ নির্দেশ দান করতে হয়েছে। সর্বোপরি বিভিন্ন রিপোর্টে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হল বিদ্যালয়ে শিশুরা তেমন শিখছে না। প্রাইভেট টিউশানের প্রকোপ বেড়ে চলেছে। স্মৃতি-নির্ভরতার ছিটেফোঁটাও কমেনি। শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করবার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। সরকার পোষিত বিদ্যালগুলি যত দুর্বল হয়েছে ততই ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির প্রভাব বেড়েছে। প্রাথমিকে ইংরাজিভাষার পঠন-পাঠন বন্ধ হওয়ায় সচেতন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের পাঠক্রম অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। ফলে তাঁরা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে ইংরাজি বিষয়টি আবশ্যিক সেখানে তাঁদের শিশুটিকে ভর্তির উৎসাহ দেখিয়েছে। রাতারাতি গ্রাম-গঞ্জেও ব্যাঙের ছাতার মত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় , এমনকি তার সূত্র ধরে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগল। মাধ্যমিকস্তরে CBSE এবং ICSE বোর্ডের অনুমোদনের জন্য শ'য়ে শ'য়ে আবেদন শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়তে লাগল। অন্যদিকে পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় সচেতন অভিভাবক-অভিভাবিকারা শিশুর যথার্থ পরীক্ষা হচ্ছে কিনা এ নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। পঠন-পাঠন বিষয়ক কাজগুলিকে গুরুত্ব কম দিয়ে সহ-পাঠক্রমিক বিষয়গুলিতে জোর দেওয়ার নীতিকেও তাঁরা খোলামনে নিতে পারেন নি। ফলে বিদ্যালয় ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের দৈনিক কৃত্যালি সম্পর্কে তাঁদের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। ফলত শহর ও শহরতলি এলাকার সরকার ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলি থেকে হু হু করে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমতে লাগল। এখন যা অবস্থা, তাতে এই পরিস্থিতি খুবই করুণ। সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তত সহস্রাধিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যাদের প্রায় কোনো ছাত্র-ছাত্রীই নেই। নয় তো নামমাত্র সংখ্যা নিয়ে এই বিদ্যালয়গুলি চলছে।

সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলি এই পরিস্থিতিকে সহজভাবে নিতে পারে নি। ফলে পাঠক্রম যাই বলুক, আসলে ভেতরে ভেতরে অনেকাংশেই পুরানো প্রক্রিয়ায় ফিরে গেছেন। ফলে সহ-পাঠক্রমিক কাজ আবার অবহেলিত হয়েছে; ইংরাজি ফিরে এসেছে; সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের নামে যা চলছে তা আসলে কিছু প্রথাগত পরীক্ষা, পঠন-পাঠন যেমন স্মৃতি-নির্ভর ছিল তাই থেকে গেছে। নম্বরের পেছনে ছোটার বাতাবরণ মোটেও কমে নি। ফলে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থাপনাই একটি দিশাহীন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। অথচ বিদ্যালয়গুলি তার পুরানো মর্যাদা ফিরে পায় নি। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আস্থা ক্রমশই লোপ পেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে চলছে কারণ সর্বশিক্ষার প্রসারে প্রথম প্রজন্মের বহু শিশু বিদ্যালয় ব্যবস্থায় ঢুকতে শুরু করেছে। আশার কথা তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল এই সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলি। ফলে গ্রাম-গঞ্জেও যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক বেসরকারি বিদ্যালয় নেই সেখানে শিশুর সংখ্যা বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে গেছে। বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির চাপ বেড়েছে। ফলে বিদ্যালয়ছুটের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। অন্যদিকে পিছিয়ে-পড়া শিশুদের সংখ্যা শ্রেণিকক্ষে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই কোনো শিশু পিছিয়ে পড়লে তাকে সমমানে তুলে নিয়ে যাওয়ারও কোনো সার্থক প্রক্রিয়া নেই। সেসব শিশু স্থানীয় বাড়ির ভাষা প্রয়োগ করে তাদের বিদ্যালয়ের ভাষায় পঠন-পাঠন একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। প্রাথমিকে একটি শ্রেণি, একটি পাঠক্রম একই রকমের মূল্যায়ন ব্যবস্থা, ঘন্টা মেপে পিরিয়ড, বিভিন্ন পিরিয়ডে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের আগমন-এ সমস্তই শ্রেণির কাজগুলিকে নিয়মতান্ত্রিক এবং একঘেয়ে করে ফেলেছে। শিশুর অধিকার, তার স্বাধীনতা, রুচি-ইচ্ছা এবং তদনুযায়ী পাঠক্রমের বিস্তার এবং কৃত্যসূচিতে বৈচিত্র্যের কোনো সুযোগ এই ব্যবস্থায় নেই। সব মিলিয়ে ব্যবস্থাপনা খুবই সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমুহূর্তে প্রাথমিকে যে পাঠক্রম আছে তা এই সমস্ত সমস্যা মোকাবিলায় সমর্থ নয়।

উপরন্তু উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যা আছে তা পাঠ্যবিষয়ের তালিকাসূচি। ফলে এই স্তরে গত কয়েক দশকে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবইয়ে অনেক

অপ্রাসঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে এগুলির দূর সম্পর্ক থাকায় শিক্ষক/শিক্ষিকারা সরকারের এই সমস্ত উদ্যোগকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসাবে দেখতে শুরু করেছেন। NCERT প্রণীত National Curriculum Framework-2055 এর তত্ত্বকে শিক্ষাভাবনার দৃষ্টিতে না দেখে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রস্তাব এ রাজ্যে চালু করে নিজেদের 'গতির সঙ্গে পা মেলানোর' চেষ্টা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং প্রদর্শনসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। তাই এক্ষেত্রেও এক সুচিন্তিত পাঠক্রম নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

২০০৫ সালে জাতীয়স্তরে প্রকাশিত হয়েছে যে National Curriculum Framework 2005, এই দলিলটি পূর্বতন আর সমস্ত NCF এর চেয়ে আলাদা এবং বেশি জনগ্রাহ্য, ফলে সমস্ত রাজ্যই এই দলিলটিকে প্রামাণ্য হিসাবে বিবেচনা করে তাদের শিক্ষা পরিকল্পনাকে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের প্রথম ধাপ হলো রাজ্যস্তরে অনুরূপ একটি রূপরেখা নির্মাণ করা। রাজ্যের বিশেষত্ব, জনসংখ্যার বৈচিত্র্য, ভূমিরূপের ভিন্নতা, বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির মানুষের সহাবস্থান এবং সর্বোপরি দীর্ঘ ইতিহাস, শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও ক্রান্তদর্শী মহামানবদের ক্রিয়াকর্মে ঋদ্ধ পরিবেশ এই রাজ্যের এক অনন্য ঐতিহ্য যা অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষাক্রমের এবং তার সঙ্গে উপযুক্ত কৃত্যসূচির অবতারণা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে NCERT র অনুপ্রেরণায় এ রাজ্যেও 2007 সালে একটি Core group তৈরি হয়েছিল। এই দলটি NCF 2005 এর প্রদর্শিত শিক্ষাক্রমের ধারণার আলোয় বর্তমান পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করেছেন। NCF 2005 প্রদর্শিত বিদ্যালয় শিক্ষা পাঠক্রম মূল সুপারিশগুলিকে কার্যকরী মেনে নিয়েও বিভিন্ন কারণে বাস্তবে রূপায়ণ করার সমস্যাগুলি দেখিয়েছেন (যেমন- এই ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনার সমস্যা, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, কোনো কোনো বিষয়ে গুরুত্ব হ্রাস ইত্যাদি), যেগুলি নিতান্ত পরিচালনাগত। এই ধরনের সমস্যা থেকে কোনো ব্যবস্থাপনাই কোনো দিনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না। তবু তাঁদের সুপারিশ "However we have kept our mind open and would like the debate to continue" ফলে পাঠক্রমে গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি ২০০৩-এর পর থেকে। প্রাথমিক স্তরে গণিত এবং ইংরেজি পুস্তকের কিছু পরিবর্তন হলেও উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকস্তরের বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। তবে তাঁরা বেসরকারি প্রকাশনায় ছাপা পাঠ্যপুস্তকগুলির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, "It is found from experience that many of these books are of poor quality, full of mistakes including conceptual errors and often inflated with unnecessary contents added illegally after obtaining approval "। এই বিষয়টি বর্তমান কমিটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অন্যদিকে এই দলিলটিতে দেখা গেছে 'শান্তির জন্য শিক্ষা' বিষয়টিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তাঁরা 'Peace lawyer' এর ধারণাটি বাদ দিয়ে অসাম্য-অবিচার-হিংসা-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ- সম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং বাজার অর্থনীতির কদর্যতার বিরুদ্ধে একটি যুক্তি নির্ভর মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন।

এছাড়া সেখানে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবু বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কথা উল্লেখ নেই বরং ব্যবস্থাপনার সঠিক উন্নতির কথা সুপারিশ করা হয়েছে।

সর্বোপরি, দেখা গেছে NCF 2005 চালু হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক চাপে পরিবেশবিদ্যা, জীবনশৈলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের বিষয়ে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। ফলে শিশুদের উপর পাঠ্যপুস্তকের চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই NCF 2005 কে অবলম্বন করে রাজ্যের শিক্ষা-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

উপরন্তু শিশুর শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত একটি আইন Right to free Compulsory Education Act 2009 বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এটি শিশুর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লাগু হয়েছে। ফলে পাঠক্রম পাঠ্যসূচি এবং পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মূল অভিমুখটিই বদলে গেছে। আগে একটি বিদ্যালয় যেভাবে সমাজে সেবা বিতরণ করত তার মূল সুরটিই মূলত পরিবর্তিত হয়েছে : RTE ও NCF এর ধারাগুলি সামনে রেখে যে যে পরিবর্তন আসতে চলেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল।

যা আছে	এখন যা হতে চলেছে
১. এটি অনেকাংশে শিক্ষককেন্দ্রিক, শিক্ষকই মূলত ঠিক করে নেন কতটা পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, এবং কীভাবে অভিভাবক ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন।	২. এটি এখন পুরোপুরি শিশুকেন্দ্রিক হতে চলেছে। শিশুর অধিকার, তার চাহিদা, ইচ্ছা, সামর্থ্যের স্তর এবং নিজস্ব গতি সবটাই এই ব্যবস্থায় মর্যাদা পেতে চলেছে।
২. শিক্ষক-পরিচালিত ব্যবস্থা হওয়ায় ন্যূনতম শৃঙ্খলায় বাঁধা থাকে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতি। শ্রেণির সময়-সারণি, মূল্যায়নবিধি, খাতা দেখা, ঘন্টাবাজা, ঐ সময়ের মধ্যেই পড়ানো শেষ করা ইত্যাদি। এটি অনেকটা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত। শিশু শিখছে কিনা এটি দেখার তেমন কোনো সুযোগ নেই।	২. শিশু শিখছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে একটি নমনীয় পাঠক্রম দরকার যা কোনো নির্দিষ্ট বিধিতে শৃঙ্খলিত নয়। বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ও সেখানকার পরিস্থিতি অনুসারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত এই ব্যবস্থাপনা। তাই সবক্ষেত্রে থাকে নমনীয়তা । সময়-সারণিতে শিশুর জন্যে আগাধ সময়-পরিসর (Space) দেওয়া থাকে। যে শিশু যেখান থেকে যেমনভাবে শুরু করতে চায় তার ব্যবস্থাও এখানে থাকে। ফলে শিক্ষকের স্বাধীনতা (autonomy) অনেকাংশে স্বীকৃত।
৩. পাঠ্যপুস্তকই শিশুর একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র। অন্য ধরনের সামগ্রীর কথা বলা হলেও মূল্যায়ন পদ্ধতি যেহেতু পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক, তাই এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ শিশুর নেই। অভিভাবকরাও এর বাইরে যেতে উৎসাহ দেন না।	৩. পাঠ্যপুস্তকটি অন্যান্য অনেক শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম। ফলে একমাত্র পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে পঠন-পাঠন হয় না। মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তাই। ফলে শিশুর শিখন জগৎ তৈরি করাই এই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।
৪. মূল্যায়ন হয় পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক। স্মৃতি-নির্ভরতা এই ব্যবস্থায় অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। বিষয়টিকে না বুঝে শুধু মুখস্থ করে ভাল মার্ক্স্ পাওয়া এই ব্যবস্থায় কোনো কঠিন কাজ নয়। দুটি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ক্ষমতা যাচাই হয়। তার সার্বিক অগ্রগতির কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। বিষয়ভিত্তিক উৎকর্ষ বড় কথা; শিশুর সামর্থ্য এবং দক্ষতা নিরূপণের মূল্য গৌণ।	৪. মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন ও অন্যান্য কৃত্যালি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের সমজাতীয় কাজ দিয়ে এই মূল্যায়নপত্র তৈরি করা দরকার। তা ছাড়া শিশুর সামর্থ্য বিকাশে অগ্রগতি কতটা তা নিরূপণের জন্য অজস্র কৃত্যালি প্রতিদিনই হতে পারে। তার উপর ভিত্তি করে তার 'রিপোর্ট কার্ড' তৈরি হবে। সেটি মূল্যায়নের একটি অংশ। না বুঝে মুখস্থ করে এক্ষেত্রে কোনো লাভ নেই। কারণ সেগুলি কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ মূল্যায়নে নেই। বোঝা, উপলব্ধি করা এবং প্রয়োগ করা এগুলি মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়।
৫. প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে পাঠ্যবইটিকে আরও স্বচ্ছভাবে চর্চা করানোর সুযোগ থাকে। প্রাইভেট টিউটাররা 'অনুশীলনী করাতে যেহেতু সিদ্ধহস্ত এবং এই অনুশীলনীর উপর ভিত্তি করেই হুবহু মূল্যায়নপত্র তৈরি হয়, ফলে অনুশীলনীকে মুখস্থ করার দিকে ঝোঁক যায়। অন্যদিকে প্রাইভেট টিউশনির উপর নির্ভরতা বাড়ে। উপরন্তু পাঠ চলাকালীন শিশুর নিজের শেখার ব্যপারটি এখানে অবহেলিত থাকে বলে শিশু শ্রেণিকক্ষে অনেকটা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মতন। অনেক বিষয় না বুঝেই ক্লাস শেষ হয়ে যায় এবং তারা বাড়ি আসে 'বাড়ির কাজ'	৫. এখানে শিশুর বোঝা ও নিজে শেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই না শেখা বা না বোঝা অবস্থায় কোনো শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। সময়-সারণিটিকে তাই অনেক নমনীয় করা হবে। বাড়ির কাজ দেওয়া হলেও তা হবে শ্রেণিকক্ষে চর্চিত বিষয়বস্তুর সমজাতীয় কাজ, ফলে শিশু নিজেই সে কাজটি করতে পারবে । প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজনীতা শিশু নিজেই খারিজ করে দেয় । মুখস্থ না করে বিভিন্ন Project work, উদাহরণ উদ্ভাবন, বিধিনিয়ম নির্মাণ-এই জাতীয় অভিনব কাজ তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে

নিয়ে। এগুলি বাড়িতে কষতে পারে না বলে প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিতে হয়।	হবে।
৬. সব বিষয়গুলিকে এখানে আলাদা ভাবে দেখা হয়। শিক্ষকরাও এক একটি বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু শিশুর শিখন যে সমন্বিত বহুধারা মিশ্রিত এক প্রক্রিয়া তা এখানে অবহেলিত। ফলে শিশুর কোনো ' Zone of development' গড়ে ওঠে না, এবং সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই Zone টি টপকে নতুন Zone এ যাওয়ারও কোনো তাগিদ থাকে না। ফলে শিখন প্রক্রিয়া খুবই ব্যাহত হয়।	৬. এখানে প্রাথমিকে এবং অনেকাংশে উচ্চপ্রাথমিকে এই সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হবে। তাই শিখনের সময়ে বিষয়ের ক্ষুদ্র বেড়াজালকে টপকে বৃহত্তর শিখনের ক্ষেত্র নির্মাণে সাহায্য করবে। তাই পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও প্রাথমিকে কম করতে হবে এবং উচ্চ প্রাথমিকেও পরিবেশবিদ্যা, জীবনশৈলীর মতো পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বাদ দিয়ে সমগ্র পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক এবং পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বিষয়গুলিকে সংযোজন করতে হবে।
৭. পাশ-ফেল প্রথা এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই। পাশ-ফেল প্রথা না থাকলে এই ব্যবস্থাপনার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। পঠন-পাঠন সামর্থ্যভিত্তিক না করে, মূল্যায়নপ্রক্রিয়া সামর্থ্য-নিরূপক না করে শুধুমাত্র পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় জনমানসে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।	৭. এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু সব শিশুকেই একটি গ্রহণযোগ্য মানে আনার চেষ্টা প্রথম দিন থেকেই থাকছে। তাই শিশু যতদিন বিদ্যালয়ে আসে ততদিন সে তার নিজস্ব স্তর থেকে আরও একটু বেশি শিখে নেয়। ফলে তার মধ্যে একটি শিখন-ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সামর্থ্য যাচাই এর জন্য সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হলে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই শিশুকে ফেল করানোর মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না। শিশু নিজে তার পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়ে উঠে।
৮. সমগ্র ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়াদের যেমন কোনো স্থান নেই। একবার কেউ পিছিয়ে পড়লে তার জন্য বিদ্যালয়ের আর কিছু করার থাকেনা। উপরন্তু RTE র ফলে 'বয়স অনুযায়ী' কোর্স ভর্তির বিষয়টি চালু হলে ঐ শিশুরা কীভাবে প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে তাও স্পষ্ট নয়। সব শিশুকে নিয়ে সেতুপাঠক্রম চালানোর মত অবাস্তব পরিকল্পনায়র কোনো অর্থ হয় না। এ ব্যাপারে প্রচলিত শিখন ব্যবস্থা ও পাঠক্রম কোনো দিশা দেখাতে পারে না।	৮. এখানে বিষয়টিকে বিবেচনা করেই পাঠক্রম রচনার সুযোগ আছে। যেহেতু শিশুর সামর্থ্য বৃদ্ধিই এই ধরনের পঠন-পাঠনের মূল লক্ষ্য তাই যে কোনো স্তরের শিশুকে শ্রেণি কক্ষে স্থান দিতে multilevel class-room এর ধাঁচে কৃত্যালি নির্মাণ করা যায় এবং নয়া পাঠক্রম সেই নমনীয়তা আনতেই আগ্রহী। অথচ যাদের আপাতভাবে পিছিয়ে পড়া বলা হয় তাদের যে বেশ কিছু বিষয়ে উৎকৃষ্ট সামর্থ্য আছে তা আবিষ্কার করা এবং তাকে অন্য অত্যাবশ্যক বিষয়ে ব্যবহার করা এই পাঠক্রমে সহজ। ফলে এধরনের শিশুরা এখানে স্বস্তিবোধ করে এবং সহজে শিখতে পারে।
৯. এখানে প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থা অনেকাংশ কঠিন এবং দৃঢ় না হলে সমগ্র ব্যবস্থাপনার অবনমন ঘটতে পারে। বিগত কয়েক দশকে এখানে পরিদর্শনের মান ধীরে ধীরে নেমে গেছে। জনগণের অংশগ্রহণের নামে বিকল্প প্রশাসন তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন চালু সরকারি প্রশাসন দুর্বল হয়েছে, অন্যদিকে যোগ্য প্রশাসনের অভাবে কাজের মানে অবনমন ঘটেছে।	৯. এখানে শিক্ষা প্রশাসন হবে যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে । নয়া ভাবনায় প্রত্যেক কর্মীকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেওয়ার কথা আছে। শিক্ষকেরা তার শ্রেণিকক্ষে যেমন স্বাধীন, অন্যদিকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহিত করাতে হবে। এছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাজে আনতে হবে পরিবর্তন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীর স্ব স্ব স্থানে স্বাধীনতা (autonomy)

এখানে কেন্দ্রিকতার দিকে বেশি ঝোঁক আছে। উপরের নির্দেশ ছাড়া কেউ দায়িত্ব নিতে চান না। ফলাফল (outcome) এর উপর কোনো জোর সেখানে থাকে না।	স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি বিদ্যালয়গুচ্ছের ধারণাটি এই ব্যবস্থার মধ্যে ভীষণভাবে কার্যকরী হতে পারবে। যৌথ পরিচালনায় দায়িত্ব গড়ে তোলা এবং কেন্দ্রিকতা বর্জন করে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার ভিত্তিটি গঠিত হতে পারে এই ব্যবস্থায়।
১০ শিক্ষকদের 'নঞর্থক' দৃষ্টিভঙ্গি বা সন্দেহের চোখে দেখা এই ব্যবস্থার ত্রুটি। শিক্ষকেরা হয়তো কিছু করবেন না এই ভয় থেকে বারে বারে ন্যূনতম কাজটি সুনিশ্চিত করার জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের সাফল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ন্যূনতমের নীচে নেমে গিয়েছে।	১০. এখানে শিক্ষককে মূল অনুপ্রেরক হিসাবে রাখা হয়েছে। তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করাই পাঠক্রমের নবদিশা। শুধুমাত্র একটি বিস্তৃত রূপরেখা দেওয়া থাকবে এবং পাঠ্যবই এর সঙ্গে অন্যান্য সামগ্রীর কথাও বলা থাকবে। শিক্ষক শিশুর সামর্থ্যকে মাথায় রেখে শ্রেণির কাজে এগোবেন। গতি বাড়ানো বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাঠ্যসূচির কম/বেশি তিনি নিজেই করে নিতে পারবেন। সাফল্যের চূড়ান্ত পরিকল্পনা যেমন একজন শিক্ষকই তৈরি করবেন, তেমনি সাফল্যের বিশ্লেষণও করবেন তিনি। শিক্ষক নিজে ঐ শিখন (Learning) এর উপর পরবর্তী পরিকল্পনা নেবেন। এখানে পরিদর্শন হবে কীভাবে শিক্ষক তাঁর পরিকল্পনা করেছেন এবং তার উপর নিজের কাজের খতিয়ান নিজেই করবেন।

ফলে বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য আরও কিছু কৃত্যালি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হচ্ছে। তাই নতুন পাঠক্রম রচনার উদ্যোগের পশ্চাতে এই **শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯** এর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। **এই আইনের ২৪ নং ধারায়** শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বিষয় স্পষ্ট বলা আছে :

২৪) ক) বিদ্যালয়ে নিয়মিত এবং সময়ে আসা,
খ) ধারা ২৯-এর উপধারা (২) অনুযায়ী পাঠক্রম পরিচালনা ও তা সমাপ্ত করা
গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠক্রম সমাপ্ত করা
ঘ) প্রতিটি শিশুর শেখার ক্ষমতার মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজন মতো আরো সাহায্য করা

ঙ) বাবা মা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করা এবং শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি, তাদের শেখার ক্ষমতা, তাদের শেখার অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা এবং

চ) অন্যান্য কাজ যেগুলি কর্তৃপক্ষ করতে বলবেন সেগুলিও করা।

অন্যদিকে **২৯ নং ধারায়** পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের করণীয় নিয়ে যা বলা আছে তা হল:

২৯) ১) সংশ্লিষ্ট সরকারের নোটিস অনুযায়ী গঠিত শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেবেন।

২) উপধারা (১) অনুযায়ী পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন-

(ক) সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা।
(খ) শিশুর সঠিক বিকাশ
(গ) শিশুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও মেধার বিকাশ
(ঘ) দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ
(ঙ) কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা, শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা
(চ) শিশুর মাতৃভাষা হবে যতটা সম্ভব শিশুর শিক্ষার মাধ্যম
(ছ) ভয়, আতঙ্ক বা উদ্বেগ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখা এবং তাকে মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করা
(জ) শিশুর জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগকে কাজে লাগাতে ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়নের প্রচলন

উপরের আটটি অংশ NCF 2005 এর নির্যাসমাত্র, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের যা করণীয় তা সংক্ষেপে এই ধারাটিতে উল্লিখিত হয়েছে।

অন্যদিকে NCERT কে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ে জাতীয় স্তরে Academic Authority হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং NCF 2005 কে অবশ্য-অনুসরণযোগ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গত কয়েক বছরে NCF 2005 এর গ্রহণযোগ্যতা সারা দেশে সর্বজনীন হয়ে পড়েছে। তবু শিক্ষা যেহেতু যৌথ তালিকায় আছে এবং প্রতি রাজ্যই তার বৈচিত্র্যে অনেকটাই বিশিষ্ট; তাই রাজ্যের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্মাণে রাজ্যস্তরে বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও মতামত বিনিময় প্রয়োজন।

ফলত পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি (ন; ৮৪৯-এস,ই, (এস) তা; ২০/০৭/২০১১) জারি করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন। এই কমিটির সামনে নির্দেশ হিসাবে দেওয়া হয়েছে আট টি Terms of Reference (TOR)।

i) উল্লিখিত কমিটি প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবই পর্যালোচনা করবেন এবং সরকারের কাছে এমন কতকগুলি পরিবর্তন সুপারিশ করবেন যা NCF 2005 এবং RTE 2009 অনুযায়ী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে।
ii) কমিটি ইতিমধ্যে প্রচলিত ইউনিট টেস্টসহ বিভিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের ধারা পর্যালোচনা করবেন এবং সরকারের কাছে এমন এক মূল্যায়ননীতি সুপারিশ করবেন যাতে একটি শিক্ষার্থী এমনকি যাদের বিশেষভাবে যত্ন প্রয়োজন তারাও কোনো প্রকার মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ ছাড়াই ঐ মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।
iii) কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলিত পাঠ্যবই ও সহায়ক বই এর উপর নির্ভরতা এবং স্মৃতিসর্বস্বতা কমিয়ে শিশুর জ্ঞানচর্চাকে ধীরে ধীরে উপযুক্ত বোধের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলা যায় অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের উপলব্ধি।
iv) কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন কীভাবে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন পদ্ধতির পরবর্তন ঘটিয়ে প্রাইভেট টিউশনের উপর বর্তমান নির্ভরতা কমানো যায় এবং তার ভীতিপ্রদ প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করা যায়।
v) কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন কীভাবে শ্রেণিকক্ষে অনুসৃত পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় ভারত এবং বহির্বিশ্বে প্রচলিত সেরা কৃত্যালি এবং আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাপদ্ধতিকে সংযুক্ত করা যায় এবং তার জন্য এমন কিছু সুপারিশ করবেন যাতে দৃশ্য-শ্রাব্য শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রণালী আরও বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠে।

vi) কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন এবং এমন কিছু সুপারিশ করবেন যাতে মূল্যায়নের মান নষ্ট না করেও শুধুমাত্র নম্বর তোলার জন্য পাঠ্যবই মুখস্থ করার প্রবণতা কমানো যায়।

vii) কমিটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণের চালু ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করবেন এবং কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পাঠ্য বিষয়ের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বোধ নির্মাণের ব্যাপারে যত্নশীল হবেন তার জন্য কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন।

viii) এছাড়া কমিটি বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে আরও প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশ করবেন যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামর্থ্যের অন্তর্নিহিত পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

উপরের আটটি উল্লিখিত বিষয় পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে যে :-

i) NCF 2005 এবং RTE 2009 এ উল্লিখিত নতুন ভাবনার ক্ষেত্রগুলি বর্তমানে চালু শিক্ষাক্রমে অঙ্গীভূত নেই।
ii) প্রচলিত ইউনিট টেস্ট এবং সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে।
iii) পাঠ্যবই ও নোটবই এর উপর নির্ভরতা, প্রাইভেট টিউশনের প্রভাব এবং নম্বর-সর্বস্ব মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরিবর্তন দরকার।
iv) শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন দরকার এবং সেইসঙ্গে স্মৃতিনির্ভরতাকে বোধ ও উপলব্ধির জায়গায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।
v) বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের হাল নিয়েও যে সরকার চিন্তিত তা এই নির্দেশনামায় স্পষ্ট।

বর্তমানে চালু শিক্ষাক্রম কেন বাস্তব পরিবেশে সফল হচ্ছেনা তাই নিয়ে এখন পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। তাই শ্রেণিকক্ষ ও শিশুর অবস্থার যে দিকগুলি খতিয়ে দেখার কথা উপরে উল্লিখিত হল তা ছাড়াও আরও একটি বিষয় রয়েছে তা হল কীভাবে এই পাঠক্রমটি বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করা হবে। তাই এই বিষয়টিও বর্তমান কমিটি বিবেচনার মধ্যে এনেছেন।

ফলে বর্তমান কমিটি 'বাস্তব রূপায়ণের প্রকৌশল নির্ধারণ' সহ মোট নটি(৮+১) বিষয় নিয়ে কাজ করতে ২৭ জুলাই প্রথম সভা আহ্বান করেন। মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সভা ৩ মাসের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেবার অঙ্গীকার করে অভীষ্ট কাজ শুরু করেন।

কমিটি এই পর্বে কর্মরত শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নিয়ে উপদলে বিভক্ত হয়ে এই কাজটি শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকস্তরের পরে উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে সমস্ত বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে চালু পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক এর সঙ্গে NCERT রচিত পাঠক্রম এবং পাঠ্যবই গুলির তুলনা ও বিশ্লেষণ করেন। এই সঙ্গে কমিটি বিগত ৫০ বছরে জাতীয় স্তরে এবং এই রাজ্যে যে সমস্ত শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা, সমীক্ষা হয়েছে এবং ক্রান্তদর্শী সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার নথিগুলি সযত্নে দেখেছেন। নথিগুলি নিম্নে উল্লিখিত হল :

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৫৪
চেয়ারম্যান : ডঃ বি বি দে
(খ) প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যসূচি কমিটি ১৯৭৪
চেয়ারম্যান : অধ্যাপক হিমাংশুবিমল মজুমদার
(গ) শিক্ষা কমিশন ১৯৯১
চেয়ারম্যান : ডঃ অশোক মিত্র
(ঘ) পবিত্র সরকার কমিটি ১৯৯৮

(ঙ) বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি ২০০১

সভাপতি : অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(চ) কোর কমিটি NCF 2005

সভাপতি : অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(ছ) প্রতীচী ট্রাস্ট রিপোর্ট-২

(জ) Low mean & High Variance's Quality of Primary education in Rural West Bengal – Jyotsna Jalan with Jharna Panda

(ঝ) Study on Private tuition by SCERT.

(ঞ) Document of SLIP, SLIP+ & ILIP organised by SSA, West Bengal

(ত) Report of SCERT on School Cluster Organisatin, A Project of Education (SCOPE) organised by Directorate of School education.

(থ) Draft Report on Restructuring of school education system in West Bengal by IIM Kolkata

(দ) প্রতীচী ট্রাস্ট আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে পাঠক্রম সংক্রান্ত গণকমিটির পরামর্শ।

(ধ) Reach India ও বিক্রমশীলা আয়োজিত গুণমান উন্নয়ণ প্রকল্পের অধীনে 'সম্ভব' নামক সংস্থা কর্তৃক নির্মিত শিখন সম্ভার।

(ন) NEEV নামে কলকাতায় কর্মরত একটি প্রতিষ্ঠানের নির্মিত 'শিখন সম্ভার'।

(প) বিক্রমশীলা নির্মিত বিভিন্ন পুস্তিকা ও বিবরণ।

(ফ) 'প্রথম' আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের ফলাফল ও বিবরণ।

এছাড়া ডঃ মর্মর মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ এ কে জালালউদ্দিনের সাথেও বর্তমান কমিটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রথা থাকবে কি না তা ঠিক করতে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে বিতর্কসভার ও আয়োজন করেছেন। শুধু তাই নয় সদস্যগণ লোরেটো ডে স্কুল ঘুরে দেখে নিযোগকারি সমন্বিত শিখন প্রক্রিয়া অনুধাবন করেছেন। হাওড়ার উদং গ্রামে পরিচালিত কৃত্যালি-নির্ভর শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণও তাঁরা দেখেন। এছাড়া NEEV ও বিক্রমশীলা আয়োজিত শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সুপারিশে বিবেচনা করেছেন। হাওড়া সর্বশিক্ষা অভিযান আয়োজিত UNICEF এর অর্থ সাহায্যে ABL model এ পঠন-পাঠন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকার সঙ্গে মতামত বিনিময় করে তাঁরা যা উপলব্ধি করেছেন তাই সুপারিশপত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

নথিগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক দশক ধরে কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবর্তনের ধারা আবর্তিত হয়েছে তা বোঝা গেছে। পাশাপাশি আলোচনা থেকে আগামী দিনে পাঠক্রমের ধারা কেমন হওয়া উচিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে NCF 2005 এর সংশ্লিষ্ট position paper গুলিও খতিয়ে দেখে তাঁরা মূলত তিন প্রকারের পরিবর্তনের সুপারিশ করেন।

(১) পাঠক্রমে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি;

(২) নতুন শিক্ষাক্রমের বাস্তব রূপায়ণের প্রকৌশল এবং শিক্ষা প্রশাসনে নতুন ভাবনার জন্য প্রস্তাবসমূহ;

(৩) নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠসূচি

খ) প্রথম ভাষা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

গ) দ্বিতীয় ভাষা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

ঘ) তৃতীয় ভাষা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

ঙ) গণিত তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

চ) পরিবেশ পরিচিতি তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

ছ) স্বাস্থ্যশরীর চর্চা ও সৃজনমূলক কাজ তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

জ) পরিবেশ পরিচিতি- বিজ্ঞান ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
ঝ) পরিবেশ পরিচিতি- ভূগোল ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
ঞ) পরিবেশ পরিচিতি- ইতিহাস ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
ত) পরিবেশ ও জীবনবিজ্ঞান নবম ও দশম শ্রেণির জন্য
থ) পরিবেশ ও ভৌতবিজ্ঞান নবম ও দশম শ্রেণির জন্য

সুপারিশসমূহ

(১) পাঠক্রমে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি :-

জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতার ক্ষেত্রে শিক্ষা র্থীর যে কাম্য সাম র্থ্য বর্তমান শিক্ষাক্রমে (প্রাথমিকস্তরে) উল্লিখিত হয়েছে তা গ্রহণ করে অতিরিক্ত যে বিষয়গুলিকে নতুন পাঠক্রমের অভিমুখ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে তা নিচে বর্ণনা করা হল। অন্যদিকে উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যেহেতু কোনো পাঠক্রমের উল্লেখ নেই তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আধুনিক পাঠক্রমের নতুন রূপরেখা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১. নয়া শিক্ষাক্রমে গৃহীত কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

১.১ শিশুর মর্যাদা ও অধিকার : কমিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিশুর অবস্থান খতিয়ে দেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহে শিশুরা কেমন থাকে তাও আলোচনা করেছেন এবং সবাই একমত যে শিশুর অধিকার রক্ষার বিষয়টি এত বিস্তৃত যে তা উপলব্ধি করা এবং তাকে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মতো যথেষ্ট সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ এখনো গড়ে উঠেনি। শিশুদের এখনো বড়দের ইচ্ছা, পরিকল্পনা এবং সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে চলতে হয়। ফলে শৈশবে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা ক্রমশই ব্যাহত। অথচ শিশুর অধিকার এখন সারা বিশ্বে একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। তবু ভারতে ঐ আইনের প্রচলন হতে এত বিলম্ব হল। তাই পাঠক্রমের নতুন অভিমুখ হিসাবে এখন শিশুর অধিকারকেই একমাত্র উপজীব্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত বলে কমিটি মনে করেন । যেহেতু প্রতি পদক্ষেপে বিদ্যালয়গুলিতে এই অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাই পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুর অধিকার রক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত করার কথা এই কমিটি ভেবেছেন । তাঁরা নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন :

১.১.১ শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক **শিশুকে যোগ্য ম র্যাদা দান** এবং শেখার স্বার্থে তার মধ্যে আ ত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা একান্তভাবে দরকার।

১.১.২ শিশুদের মধ্যে অসম্ভব ক্ষমতা রয়েছে এবং নতুন কোনো প্রযুক্তি বা বিষয় গ্রহণে তারা যে কোনো বয়স্কদের চেয়ে গতিশীল তা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতামাতাদের স্বীকার করতে হবে।

১.১.৩. শিশুদের নিজের সম্পর্কে যে ধারণা তা গড়ে উঠে বড়দের কাছে থেকে শুনে শুনে। তাই প্রথম থেকে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানোর মতো কাজ ও কথা ব্যবহার করলে ঐ শিশুরা পরবর্তীকালে আত্মবিশ্বাসী নাগরিকে পরিণত হতে পারে। তাদের হতাশ করে দেওয়ার অধিকার বড়দের নেই।

১.১.৪ যেকোনো শিশু কোনো না কোনো বিষয়ে উৎকর্ষ দেখাতে পারে। সে ব্যাপারে তার সামর্থ্য অনন্য। এই ভাবনা মাথায় রেখে শিশুদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে তাদের নিজস্ব **সামর্থ্যের মানচিত্র নির্মাণ** করা শিক্ষকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে কমিটি মনে করেন। সমস্ত কাজ শুরু হওয়ার আগে এই সামর্থ্য মানচিত্র (competency mapping) এর কাজ সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে করে নিতে হবে।

১.২ বিদ্যালয়ে মিশ্র সংস্কৃতি : ভারতের মতো দেশে বৈচিত্র্যের বাতাবরণ এত বেশি যে এখানে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ভিন্নতা তো আছেই। এমনকি একটি গ্রাম এবং তার জনগোষ্ঠী, তাদের ধর্ম, উৎসব, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং পারিবারিক শিশুলালন পদ্ধতি সবই পাশের একটি গ্রামের চেয়ে আলাদা হতে পারে। এমনকি একই গ্রামে ভিন্ন সংস্কৃতিযুক্ত জনগোষ্ঠীরা এক সঙ্গে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারেন। এটা সাধারণভাবে কখনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। এই যে ঐক্যের সুর এবং তার শক্তি-এটাও ভারতীয় গণতন্ত্রের একটা কেন্দ্রীয় দিক। সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গও একটি মিশ্র জনগোষ্ঠীর রাজ্য। বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতিযুক্ত এই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো।

কিন্তু কমিটি বিচার করে দেখেছেন যে, এই মিশ্র সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটি ক্রমাগত অপসারিত হতে চলেছে। অত্যধিক বাজার অর্থনীতির ছোঁয়া এই রাজ্যকেও গ্রাস করেছে। ফলে এই 'মিশ্রতাকে' শক্তি হিসাবে না দেখে 'ক্ষতিকারক' একটি বিষয় হিসাবে দেখা শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিকভাবে সমর্থ মানুষদের মেরুকরণ প্রক্রিয়া। যাঁরা সমর্থ তাঁদের অনেকেই এই মিশ্র সংস্কৃতিকে স্বীকার করতে নারাজ । ফলে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এবং তথাকথিত ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তির চাপ ক্রমশ বাড়ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে admission test নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে সমাজে মেরুকরণের প্রক্রিয়াটি আরও শিকড় গাড়ছে । বেসরকারি বিদ্যালয়ে পিতামাতারও ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রচলন হয়েছে। কোনো অভিভাবক তাঁর সন্তানকে গ্রামের কোনো বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করালে তিনি প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজনের দ্বারা সমালোচিত হতে শুরু করেন।প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন-২ এই ধরনের একটি case study তুলে ধরছেন (পৃ: ৮২) যেখানে একজন মা লিখেছেন, "আমি আমার শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছি এবং তাকে 'প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের' সাথে পড়তে পাঠাচ্ছি এই সিদ্ধান্তটি তাদের কাছে প্রায় অপরাধের সামিল"। অন্যদিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩ নং ধারায় ৪ নং উপধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে-

" ছয় বছর বয়সের বেশি কোনো শিশু যদি কোনও স্কুলে ভর্তি না হয়ে থাকে অথবা ভর্তি হওয়ার পরও যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে থাকতে পারে, তাহলে তার <u>বয়স অনুযায়ী ক্লাসে</u> সে ভর্তি হবে।" এবং "কোনো শিশু যদি তার বয়স অনুযায়ী ক্লাসে ভর্তি হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্যদের সঙ্গে সমানভাবে এগোবার জন্য বিশেষ কোনো পাঠ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই লাভ করার অধিকার পাবে"।

ফলে বয়স অনুযায়ী ভর্তির ব্যবস্থা করতে গেলেই শিখন-মানে কমজোরি শিশুরা বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে যেতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে উপরিউক্ত মিশ্র সংস্কৃতির পরিমণ্ডল আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে যদি কোনো শ্রেণিকক্ষে উন্নতমানের কয়েকজন শিশু থাকে, তবে সেই শ্রেণিতে পিছিয়ে-পড়া দুর্বল সমাজের শিশুরা ভর্তি হলে কি ঐ উন্নতমানের শিশুরা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ? এই সংবেদনশীল বিষয়টি তাই কমিটিকে ভাবিত করেছে। সমাজের মধ্যে দীর্ঘ চর্চায় গ্রথিত সমন্বয়ের বাতাবরণটি শ্রেণিকক্ষের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভেঙে পড়ুক তা কমিটি চায় না। বিদ্যালয়গুলিকে সামাজিক ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা অতএব একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ বিষয়ে কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ :

১.২.১. শ্রেণিকক্ষে শিশুদের মধ্যে ভিন্নতা এমনকি **আর্থিক সচ্ছলতার তারতম্যও শ্রেণিকক্ষের সম্পদ।** শুধু তাই নয় শিখনস্তরের ভিন্নতাও কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়। বরং এই তারতম্যকে সদর্থক অর্থে ব্যবহার করতে পারাই হল পাঠক্রমের মূল্য উদ্দেশ্য। কোনো পাঠ্য বিষয়ে শিশুর দুর্বলতা মানে এই নয় যে শিশুটি সমস্তকাজেই দুর্বল। দেখা গেল নতুনভাবে ভর্তি হওয়া শিশুটি পাঠে ভীষণ দুর্বল কিন্তু বাহ্যিক খেলাধূলায় খুবই পটু অথবা ভালো মাটির পুতুল তৈরি করতে পারে বা ঘুড়ি তৈরিতে তার মতো দক্ষ কেউ নেই। হয়তো দেখা যাবে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় সে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। পাঠক্রমে পিছিয়ে-পড়া শিশুর এই সামর্থ্য প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। শিশুর অধিকার রক্ষার স্বার্থে তার মধ্যে ইতিমধ্যে সঞ্চিত সামর্থ্যের অনুসন্ধান করা এবং তার ভিত্তিতে শিশুটির ব্যক্তিত্বের সদর্থক সামর্থ্যের দিকগুলি নিয়ে মানচিত্র তৈরি করা জরুরি। হয়তো দেখা যাবে পঠন-পাঠনে উন্নত অনেক শিশুর কাছে সেগুলি অনুকরণযোগ্য। তাই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে এই গুণাবলির বিস্তার ও বিকাশ এই মিশ্রসংস্কৃতি যুক্ত শ্রেণিকক্ষে সহজেই সম্ভব হবে । বর্তমান কমিটি মনে করেন শ্রেণিকক্ষে এরকম একটি ফলপ্রসূ পরিমণ্ডল তৈরি করা পাঠক্রমের আর একটি উদ্দেশ্য।

১.৩ শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণ : বর্তমানে সমাজে বৈষম্য একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো রূপ নিয়েছে। বৈষম্য দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের রূপটি অন্যরকম। একই শ্রেণিতে

বালক-বালিকাদের মধ্যে একটি স্থায়ী বৈষম্য আগে থেকেই রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যার কারণে উদ্ভূত বৈষম্যের পরিস্থিতি। এই বৈষম্যের মূল শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, তা প্রোথিত রয়েছে শিশুদের এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিজেদের পরিবারে ও সমাজে। ফলে শ্রেণিকক্ষটি প্রচলিত কিছু বদ্ধমূলধারণা এবং মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ একথাও সত্য যে সামাজিকক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের কাজ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এখনই শুরু করা দরকার। একদিকে বালক-বালিকা সম্বলিত একটি শ্রেণিতে কোনো বালিকাকে সেরা শিক্ষার্থী হিসাবে মেনে নিতে রয়েছে জমাট বাঁধা মানসিক বাধা আবার অন্যদিকে বালিকারা সাধারণত অঙ্ক ও বিজ্ঞানে ভালো নয় এটি একটি বহুল প্রচলিত ধারণায় পরিণত হয়েছে। আবার যে বালিকা তা অর্জন করতে পারে তাদের নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবে দেখারও মানসিকতা রয়ে গেছে। অন্যদিকে, জাতি, ধর্ম ও প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যার কারণে উদ্ভূত বৈষম্যের বহুমুখী ধারা শ্রেনিকক্ষে ও বিদ্যালয় পরিচালনায় দেখা যায়। এই সমস্যা নিরসনে সর্বশিক্ষা অভিযান গত কয়েকবছর যাবৎ একাধিক প্রশিক্ষণ ও মাতা-শিক্ষক কমিটির সভা আহ্বান করেছেন। এই সব প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে কিছু সচেতনতা বিস্তার করলেও আসলে মূল সমস্যাটি ছুঁতে পারেনি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বারেবারে ঐ ধরণের শিশুদের প্রতি শিক্ষকের কিরূপ আচরণ হবে তা বলা হয়েছে। Equality of treatment বা equity র কথাও বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সমগ্র ভাবনায় 'ছেঁড়া সুতো' (missing link) তা হল ফলাফলের সমতা equality of outcome. কমিটি মনে করেন 'ফলাফলের সমতা' আনতে পারলেই এই বৈষম্যের বীজ অন্তর্হিত হতে শুরু করবে।

১.৩.১ তাই কমিটি সুপারিশ করেছেন যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের রূপরেখা **'ফলাফলের সমতা'** এর উপর বেশি জোর দেবে। সর্বত্র বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়ে যাওয়া শিশুটিকে ফলাফলের বিচারে পূর্ণ সামর্থ্য অর্জনে অধিকার দিতে হবে। সেটা করতে হলে পাঠক্রমটিকে শিশুর নিজের পরিবেশ ও পরিধির আয়ত্বে নিয়ে যেতে হবে। যে পরিবেশ ও বিষয়বস্তুগুলিতে শিশু স্বস্তি ও আরাম বোধ করে তা দিয়ে শুরু করে তাকে পরিধির বাইরের জগৎ এর সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে। তাই প্রাথমিকের পাঠক্রম হবে আরো নমনীয় যাতে এলাকাভেদে এই বৈষম্যের তারতম্য অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং শিশুরা সবাই মিলে পাঠক্রমের কিছু ফাঁকা রাখা অংশকে (Open space) নিজেরাই নির্মাণ করতে পারেন। এই স্বাধীনতা যেমন শিক্ষককে দিতে হবে তেমনি শিশুদের জন্য রাখতে হবে তাদের ভাললাগা ও পরিচিত বিষয়। ফলত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পঠন-পাঠন হবে বিষয় নিরপেক্ষ এবং সমন্বিত। মূলত ভাষাচর্চাই হবে মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই চর্চার মাধ্যমেই শিশু গাণিতিক ধারণা, পরিবেশের ধারণা এবং দ্বিতীয় ভাষার পরিচয় পেয়ে যাবে। শিশুদের কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরা ধীরে ধীরে ঐ সামর্থ্যে পৌঁছাতে পারে এবং যেকোনো এগিয়ে যাওয়া শিশুর মতো অনেক বিষয়েই তাদের সামর্থ্যকে সেরা বলে প্রমাণ রাখতে পারে। কমিটি মনে করেন এই ফলাফলের সমতা কে সুনিশ্চিত করা পাঠক্রমের আর একটি উদ্দেশ্য। পাঠ্যসূচি, কৃত্যালি, পঠন-পাঠন পদ্ধতি এমন হবে যাতে ঐ শিশুরা সমগ্র ব্যবস্থাপনাটিকে নিজেদের বলে মনে করে এবং তাদের সেরা সামর্থ্যের চর্চা ও প্রয়োগ করতে পারে। 'এই শিশুটি তফশীলী জনজাতিভুক্ত, তাই ওর এইটুকু শিখলেই হবে' এমন মনোভাব প্রদর্শন শিশুর অধিকার লঙ্ঘন বলে কমিটি মনে করেন। এই মানসিকতার অবসান ঘটানোই পাঠক্রমের আর একটি উদ্দেশ্য।

১.৩.২ কিছু বহুল প্রচলিত ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করছে। যেমন, ছাত্রীরা বিজ্ঞান ও গণিতে কাঁচা। এগুলির কোনো মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাই এগুলিকে দূরীভূত করার জন্য শিখন পরিকল্পনা ও শিক্ষণকালীন কৃত্যালির মধ্যে অভিনবত্ব আনতে হবে এবং সেগুলিকে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাতে হবে। শিশুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যে কোনো শিশুই যে অনেক কিছু করতে পারে তার প্রমাণ রাখার জন্য কৃত্যালিগুলিকে তাদের মতো করে সাজাতে হবে। পরে তার উপর মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদান করতে হবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৩. (ক) সুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

সুস্বাস্থ্য দেশ গঠনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত।আবার সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি হল পুষ্টি । শিক্ষার উপলব্ধিতেও পুষ্টির ভূমিকা বিরাট।দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সংযোগগুলি আমাদের জীবনচর্চায় খুব বেশি জায়গা পায়নি।পুষ্টির অভাবের একটা বড় কারণ খাদ্যাভাব, এটা সবার জানা। কিন্তু এর অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্ম [যেমন, শৌচবিধি,সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান,পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি]। সে দিকটা প্রায় অবহেলিত থেকে যায়।এই ফাঁকটি পূরণ করবার জন্য শিক্ষার সংযোগটিকে এমনভাবে তুলে ধরা সম্ভব- যাতে ছাত্রছাত্রীরা এ সম্পর্কিত জ্ঞানের অনেকটা প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়েই আত্মস্থ করতে পারে। কিন্তু এই আত্তীকরণটি আদেশমূলকভাবে সম্ভব নয়, শিশু যা করবে- সেটা সে কেন করবে, এই বৈজ্ঞানিক প্রণোদনটি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেই তা সম্ভব।

উদাহরণ হিসাবে বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ভূমিকা সুনিশ্চিত করা : এই দৈনন্দিন ব্যবহারিক দিকটিকে শিশুদের পাঠ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করতে হবে; নানাবিধ ছবি,অন্যান্য দৃশ্যমাধ্যম ও অনুশীলনের সাহায্য নিয়ে শিশুদের এই বৈজ্ঞানিক সংযোগগুলি জীবন্তভাবে যে দেখানো যায়,অল্প হলেও,তার নজির আমাদের রাজ্যের কিছু স্কুলে দেখতে পাওয়া যায়। [এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। একটি বিদ্যালয়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযুক্ত রূপায়নের ফলে শিশুরাই নিজেদের পরিবারে এই ব্যবহারবিধির প্রয়োগ সুনিশ্চিত করেছে। পাঁচ বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলবার ফল হিসাবে গ্রামটিতে জল বাহিত রোগ অনেক কমে গেছে বলে জানা গেছে।] খাবার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া,খাবার জায়গা পরিষ্কার করা, অন্যান্য শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, ইত্যাদি মোটামুটিভাবে অবহেলিত দিকগুলিকে চর্চার মধ্যে তুলে আনা আবশ্যিক। পুষ্টি নিয়ে শিশুদের মধ্যে ধাপে ধাপে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা দরকার।পুষ্টি কী,কেন, কতটা, কীভাবে ইত্যাদি বিষয় গুলি চতুর্থশ্রেণি থেকেই শুরু হতে পারে। অবধারিত ভাবেই পুষ্টির আলোচনায় ভয়াবহ লিঙ্গ বৈষম্যের কথা আসবে, একটু উচুঁ ধাপে এই বিষয়টিকে জীবনশৈলী শিক্ষা [life style education]-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া দরকার ।মেয়েদের অপুষ্টি থেকেই যে গোটা সমাজের অপুষ্টি-ও তার ফল হিসাবে অস্বাস্থ্য-এর জন্ম এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ টিকে নানা ভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। [অনেকেই মনে করেন যে বাঙ্গালী জনসমুদায়ের গড় উচ্চতা ও ওজন কম হওয়াটা একটা জাতিগত[racial]ব্যাপার; এই ধারণাটা সম্পূর্ণত ভুল। বিশ্বের নানা দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে মেয়েদের ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে গোটা "জাতির বামনত্ব"[dwarfness of the nation] দূর করা গেছে।

এই সংযোগটি যাতে তারা নিজেদের চোখে দেখতে পারে সেজন্য **পাঠক্রমের মধ্যে কিছু ব্যবহারিক দিক** যোগ করতে হবে। যেমন ওজন, উচ্চতা, রোগের প্রকোপ,স্বাস্থ্যগত আচরণ [health behaviour],স্থানীয় স্বাস্থ্যসুবিধার লভ্যতা ও ব্যবহার ইত্যাদি, আবার খাদ্য তালিকা, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টির লভ্যতা, পুষ্টির স্থানীয় উৎস,ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে নবম-দশম শ্রেণি থেকেই তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কাজ করা যায়। এতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি ছাড়াও লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সামাজিক ব্যাপার,গণিত ও রাশিবিজ্ঞানের মতো বিষয়, জীব বিজ্ঞান ও ভূগোলের কিছু দিক সম্বন্ধে বিশ্লেষণের আকর্ষণ বাড়বে। সেই সঙ্গে আরও যেটা খুবই দরকারি, সেটা হল লেখার দক্ষতা, পড়ার প্রতি আগ্রহ ও চিন্তার সমন্বয় ঘটানোর । এক কথায়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকটাকে শিক্ষার সাধারন পাঠক্রম ও কৃত্যালির মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে সংযুক্ত করার কাজটি হাতে নিতে হবে।এর জন্য-

(ক) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে

(খ)অভিভাবকদের মধ্যে প্রচারের কাজ করতে হবে-যা গ্রাম স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমিতির সাথে যৌথ ভাবে করা যেতে পারে।

(গ)এ সংক্রান্ত একটা ম্যানুয়েল,প্রতিটি শিক্ষকের জন্য তৈরী করতে হবে। ম্যানুয়াল তৈরির কাজে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া যায়।

১.৪. পরিবেশ শিক্ষা : শিশুর জীবনের শুরুতে শিখনের দুটি দিক (১) ভাষা ও (২) পরিবেশ। একটি শিশু বিদ্যালয়ে আসার অনেক আগে থেকেই শুরু করে পরিবেশকে জানা ও বোঝার কাজ। এই শিখনের মূল প্রেরণা হল তার কৌতূহল। কৌতূহল চরিতার্থ করতে করতেই সে নিজের ও আশেপাশের জগৎকে সহজেই চিনে নিতে পারে এবং ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরই "পরিবেশ পরিচিতি" একটি পাঠ্য-বিষয়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার ফলে, শিশুর স্বাভাবিক শেখা বিঘ্নিত হয়। মনে ভীতির সঞ্চার হয়, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ধাক্কায় জগৎকে জানার সাধারণ ইচ্ছেটুকু ঠিকমতো বিকশিত হতে পারেনা। কৌতূহলের নিরসনের জন্য তার যে স্বতপ্রনোদিত চেষ্টা তা অচিরেই নির্বাপিত হয়ে স্মৃতিনির্ভরতায় পৌঁছে যায়। বিদ্যালয় ব্যবস্থায় তাই পরিবেশ সম্পর্কে প্রচলিত চর্চাটিকে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে 'পরিবেশবিদ্যা' নামে এক নতুন বিষয় প্রচলন হয়। অথচ এমুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে সমাজ বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সমগ্র পাঠক্রম পর্যালোচনা করে একটি সমন্বিত পরিবেশ-পরিচিতি পঠন-পাঠনের প্রবর্তণ করা প্রয়োজন।

১.৪.১ তাই কমিটি এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশটি করেছেন। শিশুকে প্রথম শ্রেণি থেকে পরিবেশ সচেতন এবং পরিবেশের উপর সংবেদনশীল করে তোলার জন্য সমগ্র পাঠক্রমটি নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের কোনো প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করেন না। তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে। এই পাঠক্রমে নিজের আশেপাশের পরিবেশটিকে যাতে শিশু বাস্তবদৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে তার জন্য শিশুর উপযোগী পরিবেশ পরিচিতিকে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসে না ভেঙে **সমন্বিত ভাবে শিখনের ব্যবস্থা** করার সুপারিশ করছে কমিটি। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে 'পরিবেশ পরিচিতি' বিষয়টি তিনটি ভাগে ভাগ হতে পারে তবে মূলত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে আরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে এই বিষয়গুলিই শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। তাই কমিটি মনে করেন পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি-ভূগোল এবং পরিবেশ পরিচিতি-ইতিহাস নামে তিনটি বিষয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত থাকলে পরিবেশের অঙ্গ হিসাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে একসঙ্গে দেখা সম্ভব হবে। যেমন ইতিহাসে সুলতানিযুগের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া পরেই সে যুগের সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ, মানুষের সমস্যা, সভ্যতার উন্নয়নে সে সময়কার মানুষের অবদান, সে সময়ে জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার পরিবেশ, এ যুগের সঙ্গে তার তফাৎ ইত্যাদিকে বেশি পরিমাণে পাঠ্যসূচিতে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৪.২. শিশুর নিজের পাড়া, গ্রাম, এলাকা এবং জেলার পরিবেশ সম্পর্কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্য, নিদর্শন এবং অভিমতগুলি সংগ্রহ করে শিক্ষক একটি পাঠক্রম তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য নিয়ে তিনি এই প্রক্রিয়া চালাবেন। এলাকা পরিদর্শন, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা, পুরানো নিদর্শন দেখা এবং সংগ্রহ করা, ছবি তোলা, এই বিষয়ে গুরুত্ব বিশ্লেষণ, Practical Book নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি **জীবন্ত পাঠক্রম তৈরি** করবে এবং স্থানীয় পরিবেশ নিয়ে চর্চা করবে শিশুরা।

১.৫. বাজার অর্থনীতি ও মানুষের প্রত্যাশা : বাজার অর্থনীতির প্রভাব ক্রমশ সমাজের সাধারণ মানুষ ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের গ্রাস করেছে। তীব্র প্রতিযোগিতা, অন্ধ অনুকরণ, আত্মদর্প, প্রদর্শনকামিতার ধারা শিশুদের বিষয়ে পিতামাতার 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বাড়াচ্ছে; ফলে তার থেকে জন্ম নিচ্ছে শিশুদের মানসিক চাপ। এই আকাঙ্ক্ষা শুধুই উচ্চশিক্ষায় নয় বরং তার মূল শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে। ফলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাটিকে বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য অভিভাবক-অভিভাবিকাদের চাপ শুধু শহরাঞ্চলেই নয় এমনকি শহরতলি, ছোটোখাটো গঞ্জেও অনুভূত হচ্ছে। এই সমস্যাটি কমিটি গভীরভাবে ভেবেছেন এবং আলোচনা করেছেন। দুটি বিষয় তাঁদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে : (১) এই প্রতিযোগিতার নেশায় যখন সমাজ মত্ত তখন তার প্রতিফলন বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে পড়বেই। তার থেকে কোনো মুক্তির পথ আছে কি ? (২) যদি কোনো মুক্তির পথ পাওয়াও যায়, তবু ভবিষ্যতে শিশুটি যখন আরও কঠিন প্রতিযোগিতার বাতাবরণে নিমজ্জিত হবে তখন তার মধ্যে

হতাশা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এই হতাশা কাটিয়ে ওঠার কৌশল তাকে নিজেকেই অর্জন করতে হবে। শুধু আনন্দদায়ক পাঠক্রমের মধ্যে ঐ উদ্বেগ ও হতাশা কাটানোর কৌশল শেখানো যাবে কি? কমিটি ধরে নিয়েছেন এই প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডল যেমন সত্য তেমনি প্রতিযোগিতার শেষে সফল ব্যক্তির মর্যাদা গুরুত্ব ও অপরিসীম। এগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান কমিটি সফলদের গুরুত্বকে খাটো করে দেখতে চায় না ।

১.৫.১. তাই কমিটি বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। একদিকে যেমন **খুঁটিনাটি তথ্যের ভারমুক্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি** প্রবর্তন করা একান্তভাবে জরুরি , তেমনি অন্যদিকে প্রদত্ত শিক্ষাক্রমে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীতাকেও ছোট করে দেখছেন না কমিটি নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা যে প্রতিযোগিতার বাতাবরণে গিয়ে পড়ার বা তার পরেও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে নিজের ঘাটতি বুঝে নিয়ে আগামী দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তাই প্রতিদিনকার কাজে এবং প্রতি মূল্যায়নেই প্রতিযোগিতার মেজাজ (mood) টি ধরে রাখা শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। দলগত প্রতিযোগিতা এবং প্রত্যেকের সেরা ফলাফল বের করে আনার অনুকূল পরিমণ্ডল তৈরির কথা ভাবাটিও সমাজে দরকারি বলে মনে করেছেন কমিটি, যাতে সব শিশুই নিজে এবং দলগতভাবে সেরা কাজটি উপহার দিতে পারে। তবে সব প্রতিযোগিতাই শেষ হবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে। আনন্দের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ হবে।

১.৫.২. শিশু যাতে তার সাফল্যের মাত্রা পরিষ্কার বুঝতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাদের অসাফল্যের কারণ বুঝতেও সাহায্য করতে হবে। তবে দেখতে হবে কোনো অসাফল্যই যেন হীনমন্যতা না আনে। অসাফল্যের সঙ্গে মানসিক বা দৈহিক নির্যাতনের কালিমালিপ্ত হতে দেওয়া চলবে না। শিশুদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে সম্মান জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও সুন্দরভাবে কাজটি করার উৎসাহ দিতে হবে।

১.৫.৩. প্রতিযোগিতা থাকলে অসফলতা থাকবেই। বিভিন্ন মাত্রায় থাকবে। ফলে অসফলদের মধ্যে ব্যর্থতাকে হাসিমুখে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে **কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা** পাঠক্রমের মধ্যে যুক্ত করা প্রয়োজন। কোনো একটা প্রতিযোগিতায় অসফলতাই যে শেষ কথা নয়, তা তার বোধের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত পাঠ্যক্রম জুড়ে বিভিন্ন কাজের আয়োজনও করতে হবে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যদিকে যারা সফল তাদেরও আচরণকে প্রতিমুহূর্তে বাস্তবমুখী, সংযত এবং সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কমিটি মনে করেন, পাঠক্রমের চাপ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে শিশুটি আনন্দে কাজ করতে পারে। অথচ অসফল হলেও তা সহজেই এড়িয়ে গিয়ে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতায় আলাদা ফল দেয়। এই দিকটাও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ভাব দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছ করে তুলবে।

১.৫.৪. পাঠক্রমে মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থাকেও এই নীতির ভিত্তিতেই গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৬. মূল্যবোধের শিক্ষা এবং শান্তির শিক্ষা : সমাজে অসাম্য ও বৈষম্যের চিত্রটি সুখকর নয়। বাজার অর্থনীতি, অসম প্রতিযোগিতা, গুটিকয়েক মানুষের করায়ত্ব হওয়া সমগ্র ব্যবস্থা, সীমাহীন প্রত্যাশা ও তা পূরণে ব্যর্থ যুবসমাজ, সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রসার, পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনা ও হিংসা, সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও জাতিগত রেশারেশি, জঙ্গি কার্যকলাপ এবং তার নীতিহীন প্রশ্রয়দান, বিজ্ঞানসম্মত বিচারবোধের অভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অধঃপতন– এ সমস্ত কিছুই দেশ ও রাজ্যজুড়ে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চিত্রটিকে খুবই স্পষ্ট করে তুলেছে। কিছুকাল আগে অবধি এই অবক্ষয়রোধের চেষ্টা করতেন কিছু ধর্মগুরু। সারা দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সংশ্লিষ্ট ধর্মনেতাদের কার্যকারিতা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। মূল্যবোধের প্রসারণ নির্ভর করে জনগণের সদ্ভাবনা, সদিচ্ছা ও সদাচারের উপর। মানুষ এখন মূল্যবোধকে অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল না করে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ চিন্তার উপর স্থাপিত করতে চাইছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে

মূল্যবোধের চর্চায় ঐ অভিমুখটিই যে ক্রিয়াশীল হবে তাই স্বাভাবিক। ধর্মাচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের চর্চা ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত নয়। দ্রুত বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে প্রায়শ চোখে পড়ে। অতএব বিদ্যালয় পাঠক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, সহনশীল এবং শান্তিকামী এক বোধের চর্চা দিনে দিনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক পাঠক্রমে এই মূল্যবোধ চর্চার কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু যেটির অভাব আছে তা হল পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তকে এবং শ্রেণি পঠন-পাঠনে তার চর্চার কোনো সুযোগ নেই। এখনো পর্যন্ত প্রাথমিকে যে যে বিষয়ে চিন্তা করা হয়েছে তা হল, পাঠ্যপুস্তকে প্রথম ভাষায় এমন কিছু পাঠ-এককের সংযোজন যা দলিত ও পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির সমাজের প্রতি শিশুদের কিছুটা পরিচিতি ঘটাতে পারে; ইতিহাসে ধর্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা অবলুপ্তিকরণ এবং বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে এমন ধারণা ও ভাষার প্রয়োগ বন্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু মূল্যবোধের শিক্ষাটি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের কয়েকটি পৃষ্ঠায় সুপ্ত থাকলেই চলবে না; এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটিকে সমগ্র পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া ও নানান কৃত্যালির মধ্যে সংযোজিত করতে হবে। শুধু তাই নয় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার পথে নানাধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই বোধের স্পষ্ট ছাপ রাখা প্রয়োজন। শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্যোগই যে এখানে প্রধান হবে তা এই কমিটি মনে করেন।

NCF-2000 এবিষয়ে উল্লেখ করেছে যে, “despite more than half a century of independence, India is struggling for freedom from various kinds of biases and imbalances..... Education can play a very significant role in minimising and finally elimination of these differences by providing equality of access to quality education and opportunity. ” The School Education Committee, West Bengal, 2002 বিবরণে লিখেছেন “The Committee observes that in order to strengthen the sense of unity in diversity our system of school education must follow the principles of Secularism, Democracy and Socialism in designing value education programmes in the schools.”

NCF-2005 এই শিক্ষাটিকে ‘শান্তির জন্য শিক্ষা’ এই অভিধায় ভূষিত করেছেন। বয়ঃ ক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে শান্তির জন্য তাদের বোধ কীভাবে জাগ্রত করা যায় তার জন্য বিভিন্ন কৃত্যালির উদাহরণ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার ও ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে বলেছেন। সর্বোপরি শিশুর নিজের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা, অধৈর্য এবং নিরাপত্তার অভাববোধকে কীভাবে কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে কাটানো যায় তার নির্দেশও দিয়েছেন।

উপরিউক্ত নথি এবং নির্দেশগুলি মাথায় রেখে বর্তমান কমিটি এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন।

১.৬.১. শিশুদের উপর ‘এটি করো’ বা ‘ওটি করো না’ র নির্দেশাবলি চাপিয়ে না দিয়ে শিশুর মধ্যে **কোনটা ভালো বা শুভ তা নির্বাচন করার অধিকার** তাদেরই দিতে হবে এবং প্রয়োজনমত তা নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে।

১.৬.২. শিশুরা যাতে গণতন্ত্রকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে বুঝতে পারে (শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে নয়), তার জন্য শ্রেণিকক্ষে **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রচলন** করা (দল গঠন, দলনেতা নির্বাচন,নিজস্ব আইন নির্মাণ ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর মতামতকে দলের মত রূপে মান্যতা দান ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ) একান্তভাবে আবশ্যিক বলে কমিটি মনে করেন। কমিটি মনে করেন, একটি অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে ২০১২ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে শ্রেণিকক্ষে পুরানো পদ্ধতিতে বসার রীতির বদলে ছোটো দলে বসার রীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১.৬.৩. শিশুকে **সামাজিক প্রক্রিয়ায় শেখার পরিবেশ** তৈরি করতে সঙ্গীশিখন, দলগত শিখন, সহযোগিতামূলক শিখনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেজন্য শিখনের কাজ হবে অনেক চ্যালে ঞ্জধর্মী যাতে তা সমাধান করতে স্বাধীন চিন্তন,মিশ্র পদ্ধতি,উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। সামাজিকভাবে সেগুলিকে শিশু দলগতভাবে আলোচনা ও বিতর্ক

করে,পরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সমাধান করবে।এটাই গুণগতমানের শিক্ষা। সমগ্র শিক্ষাক্রমে এই প্রক্রিয়াটিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৬.৪. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কিছু বিশেষ করণীয় আছে তা বিবেচনা সহকারে করা জরুরি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে **ভুল করার অধিকার** দিতে হবে।
- তাদের কল্পনার পরিসর বাড়াতে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক হলেও তাদের বিতর্কের অধিকার দিতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্থবহ হৈচৈ এর অধিকার তাদের দিতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরেও বিভিন্ন কৃত্যালির ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরশিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-নির্ভর কাজ এবং শিল্পকলার চর্চা করানোর সময় শিশুদের ইচ্ছা ও রুচিকে সম্মান দিয়ে সংশ্লিষ্ট সময়টিকে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্বপরিকল্পিত কাম্য সামর্থ্যের সঙ্গে যতটা সম্ভব সংযুক্ত করতে হবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে।

- পরিস্থিতিটি আন্দাজ করা যাচ্ছে না বলে বিরক্ত হয়ে **শিশুদের মানসিক বা দৈহিক নির্যাতন দেওয়া চলবে না।** এই ধরনের নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। শিশুর উপর যে কোনো দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারে পরিপন্থী।
- অতিরিক্ত বাড়ির কাজ দিয়ে বা জরিমানা ঘোষণা করেও শিশুকে শাস্তি দেওয়া একই কারণে বর্জন করতে হবে।
- বাড়ির কাজ না করে আনতে পারলে বা ভুল করলে তাকে ভয় দেখানো বা শাস্তি দেওয়া চলবে না। অহেতুক চাপ তাকে পরবর্তীকালে অসহিষ্ণু করে তুলতে পারে।
- বাহ্যিক শৃঙ্খলার নিয়ম চাপিয়ে না দিয়ে শিশুদের মধ্যে স্বশৃঙ্খলার মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। **স্বশাসনের কানুন তৈরিতে শিশুদের অংশগ্রহণ** সুনিশ্চিত করতে হবে। ধৈর্য ধরে একটি শিক্ষককেই তা করতে হবে। শিক্ষকের অধৈর্যের মনোভাব শিশুর মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করতে পারে। তা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা দেবে।
- **লাল কালি দিয়ে “ X” চিহ্ন ব্যবহার করে O বসিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন** করে শিশু যেটুকু কাজ করেছে তার সদর্থক বিচার করতে হবে। যা পারেনি তার জন্য এমন কোনো বিকল্প পাঠ ও কৃত্যালির অনুসন্ধান করতে হবে যা শিশুটির মধ্যে আর একবার আস্থা আনতে সাহায্য করে। শিক্ষককে এটা মনে রাখতে হবে, তাকে যে বিষয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তার থেকে ও অনেক বেশি কিছু বিষয়ে তার অসাধারণ সামর্থ্য আছে। তাই তাকে তার নিজস্ব ‘zone of proximal development’ এর আয়ত্তাধীনে কাজটি দিলে সে নিজেই তা সম্পন্ন করতে পারবে এবং নিজে নিজেই ঐ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। “X” দিয়ে কেটে দিলে শিশুকে হীনমন্য করে তোলা হয়। তা তাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে বাধা দেয়।

১.৬.৫. মহাপুরুষদের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন জরুরি। স্থানীয় কৃতী মানুষ যাঁরা বিভিন্ন পেশায় সাফল্য পেয়েছেন এবং অতি সাধারণ পরিস্থিতি থেকে নিজের প্রচেষ্টায় উঠে এসেছেন তাঁদের ডেকে এনে শিশুদের গল্প শোনাতে হবে, তাঁদের কাজ দেখাতে হবে। শান্তি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুদের সঙ্ঘ গড়া যেতে পারে। Mock Panchayet, নাটক, গান, আবৃত্তি, অভিনয় এবং ছবি-আঁকা এবং খেলাধুলাকে নিয়মিতভাবে স্থান দিতে হবে । স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী কোনো চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীকে ডেকে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে হবে। কোনো গ্রামকে Project work হিসাবে গ্রহণ করে ঐ এলাকার মানুষ, পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, সাক্ষরতা এবং জীবিকা ও অর্থনীতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে শিশুরা। এগুলির কৃৎকৌশল শিশুরাই আবিষ্কার করবে শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করতে পারে। **প্রাথমিকে সমগ্র শিক্ষাক্রমের পঞ্চাশভাগই এই ধরণের কৃত্যালির মধ্যে সংযুক্ত করতে হবে। উচ্চপ্রাথমিকে ৪০ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে তা ২০ শতাংশ হারে কৃত্যালির মধ্যে সংযুক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করেন।**

১.৬.৬. এককথায় মূল্যবোধের শিক্ষায় গুরুত্বদান একান্ত জরুরি। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শান্তিপ্রিয়তা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, জাতীয়তাবোধ, অহিংসার ভাবনা, স্বশৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা, অধ্যবসায়, বিজ্ঞানমনস্কতা, কুসংস্কারবিরোধী মনোভাব, বড়োদের শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান, শ্রমের প্রতি মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রতি সচেতন মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলির চর্চা প্রতিদিনই করতে হবে এবং তা শিশুদের Report card এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১.৭. পরীক্ষা পদ্ধতি ও আটকে রাখার নীতি : বছরে দুটি পরীক্ষা না ইউনিট টেস্ট, না কি পর্বভিত্তিক মূল্যায়ন, অথবা পাশফেল প্রথা থাকবে না কি 'আটকে না রাখা নীতি', নম্বর না গ্রেড, না কি দুটিকেই এক সঙ্গে, মূল্যায়ন বা পরীক্ষার লক্ষ্য আরও মার্কস্ তোলা নাকি কতটা শেখা হয়েছে বা কতখানি আরও সাহায্য দিতে হবে সেটা জানা? এই সব বিতর্ক নিয়ে বর্তমান কমিটি খুবই ভাবিত। ইতিমধ্যে তাঁরা বিষয়গুলিকে খুবই আন্তরিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ যাবৎ সে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে বা মতামত প্রকাশ পেয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে এবং দেখা গেছে এ বিষয়ে জনমানসে মিশ্র-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। **RTE তে ২৪ নং ধারায়** শিক্ষকের যে কাজের তালিকা পেশ হয়েছে তার মধ্যে একটি হল

"২৪) a) প্রতিটি শিশুর শেখার ক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজন মত আরো সাহায্য করা।"

এছাড়া ২৯ নং ধারার ১ নং উপধারায় বলা আছে : "সংশ্লিষ্ট সরকারের নোটিস অনুযায়ী গঠিত শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেবেন।" ঐ ধারার ২ নং উপধারার (ছ) এবং (জ) এ বলা হয়েছে-

"ছ) শিশুটিকে আতঙ্ক বা উদ্বেগমুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করা,

জ) কোন বিষয় বুঝে তা কাজে লাগানোয় কতটা ক্ষমতা শিশুর আছে তা জানতে সার্বিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করা।"

অন্যদিকে NCF 2005 সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন। এই প্রসঙ্গে এই দলিলটি "আটকে না রাখার" নীতিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার সুপারিশও করেছেন। আমাদের রাজ্যে ১৯৮১ সাল থেকেই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত আটকে না রাখার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সাথে সাথে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CCE) ও চালু হয়েছে এই বছর থেকেই। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কার্যাবলি নিয়ে এর আগেও বারে বারে বিতর্ক উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিতে আন্দোলন করেছেন। অথচ গত ত্রিশ বছরে এ বিষয়ে তেমন কোনো সদর্থক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরিই হয় নি। এ বিষয়গুলি নিয়ে গত পয়লা নভেম্বর, ২০১১ বর্তমান কমিটি বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনকে নিয়ে সভা করেন। পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের ধারা কেমন হবে এবং ফেল প্রথা এবং আটকে রাখার প্রথা থাকবে কিনা এটাই ছিল বিতর্ক সভার মূল উপজীব্য বিষয়। এই সভা থেকে মূলত তিন প্রকারের মতামত উঠে এসেছে। একদল শিক্ষক বলেছেন- পাশ-ফেল প্রথা থাকা উচিত নয় এবং সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন চালানো প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি হল এই ব্যবস্থাটির ফলে শিশুরা কোনো পরীক্ষার চাপ ছাড়াই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় একশো শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার পশ্চাতে এই নীতিই বেশি কার্যকরী হয়েছে। অন্যদিকে ফেলপ্রথা না থাকায় কোনো শিশুই একটি ক্লাসে দ্বিতীয় বছরের জন্য আটকে থাকছে না। ফলে যে কোনো শিশু কাঙ্খিত মানে ওঠার জন্য যে কোনো স্তর থেকেই শুরু করতে পারছে, কোনো চাপ বলে মনে হচ্ছে না। সর্বোপরি এই মতের পক্ষে যাঁরা তারা মনে করেন যে পরবর্তী শ্রেণিতে ওঠার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর প্রতি যোগ্য মর্যাদাই দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে যাঁরা এই মতের ঠিক বিপরীতে তারা পশ্চিমবঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির উপর বেশি নজর রেখে যুক্তি স্থাপন করেছেন। 'আটকে না রাখা, নীতিকে তাঁরা 'অবাস্তব আর্দশবাদ' বলে মনে করেন। তাঁদের মতে বিগত ত্রিশ বছরে এই ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ই পঠন-পাঠনে অমনোযোগী হয়ে উঠেছেন। পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় যথাযোগ্য ফলাফলও ঘোষণা হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মান এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ

সাধারণ জনসাধারণের আগোচরে থেকে যায়। অন্যদিকে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালগুলি প্রকারান্তরে এই ব্যবস্থা কড়াভাবে চালু রাখায় সচেতন অভিভাবকরা ঐ ব্যবস্থায় প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ছাত্রাল্পতায় ভুগতে শুরু করেছে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে শহরাঞ্চল ছেয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলেও ঐ যাত্রা অব্যাহত আছে, সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান নেমে গেছে।

এই দুই পক্ষেরই যুক্তি প্রতিযুক্তিতে স্ববিরোধিতা আছে। যাঁরা আটকে না রাখার পক্ষে তাঁরা সকল পাঠরত শিশুর কাম্যমানে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির দিশা দিতে পারেননি। শিক্ষকের দয়ার উপর সমগ্র ব্যবস্থাটি ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল 'ভর্তি' হয়েছে যত হারে বিদ্যালয়ছুট এর সংখ্যাও বেড়েছে সেই হারে। আটকে না রাখার নীতি এবং ধারাবাহিক, ও সার্বিক মূল্যায়ন সঠিকভাবে প্রচলিত হলে প্রথম শ্রেণির ১০০ ভাগ শিশুই চতুর্থ শ্রেণিতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারত, কিন্তু তা হয় নি। অন্যদিকে শিশুর শিখনমান নিয়েও অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁরা প্রাথমিক স্তরেও প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রাইভেট টিউশনের এমন রমরমা অবস্থা এর আগে কখনও ঘটেনি। প্রতীচী ট্রাস্ট প্রতিবেদন-২ এবং SCERT-র বিবরণে প্রাইভেট টিউশনের বিপুল প্রসারের কথা উল্লিখিত আছে।

উল্টোদিকে ফেল করানোর প্রথা থাকলে কীভাবে শিক্ষার গুণগতমান বাড়তে পারে সেটাও খুব স্পষ্টভাবে বিরোধী ভাবনার শিক্ষকেরা বলে উঠতে পারেননি । ধরে নিই যদি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ১০০ জন শিশুর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণিতে ৪০ জন টিকে থাকে এবং চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ৩০ জনই খুব ভালো ফলাফল করে তবে সার্বিক শিশুর সংখ্যা বিচার করে মানের যাচাইএ ঐ বিদ্যালয়ের সাফল্য মাত্র ৩০%। শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণীর ফলাফলটি এখানে বিভ্রান্তিকর। এছাড়া পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, শিক্ষকের উদ্যোগের অভাব এবং পিতামাতা ও সমাজের সচেতনতার অভাবের কারণে কেন একটি শিশুকে দায়ী করা হবে তাও এদের যুক্তিতে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে মৌলিক অধিকার হিসাবে শিশুর অধিকারের প্রশ্ন তো থেকেই যায় সমগ্র বিশ্লেষণটিতে।

তাই ঐ সভায় অনেকে মধ্যপন্থায় বিশ্বাস রেখে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন:

(ক) যতদিন না বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, ততদিন পাশফেল প্রথা বিলোপ করা ঠিক হবে না। এর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) পরীক্ষা পদ্ধতি রেখে CCE চালু করা যায় কিনা দেখতে হবে।

(গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং যথাযোগ্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন ধাপে ধাপে করতে হবে।

বর্তমান কমিটি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দেখেছেন পূর্বতন সরকারের আমলেও যতগুলি শিক্ষা কমিটি ও কমিশন বসেছে, তাঁরা সবাই এই সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন, অশোক মিত্রের Education Commission এর রিপোর্টে ৩.১০ নং ধারায় বলা আছে "Although it is suggested that drop-outs have declined significantly under the new arrangements, hard statistics in support of the assertion are difficult to come by; reality the suspicion lingers, is somewhat less encouraging " রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের School Education Committee রিপোর্ট ও এ বিষয়ে বিরূপ সমালোচনায় করেছেন। তবু সারা দেশে যখন RTE চালু হয়ে গেছে এবং সারা দেশে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে সার্বিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চালু হবার দিকে, এমনকি যে কোনো অনুমোদিত বেসরকারি বিদ্যালয়েও এই ধারা আবশ্যিকভাবে চালু হতে চলেছে তখন পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে স্রোতের বিপরীতে হাঁটবে কিনা তা বিবেচনা করছেন বর্তমান কমিটি। কমিটির অনেকেই মনে করেন যে কোনো না কোনো একসময় আমাদের এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণের সময় থেকে বারে বারে বিষয়টি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি শিশুশিক্ষার অধিকার বিলটিও লোকসভায় বারে বারে আলোচনা হয়েছে । মূল্যায়নের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেমন কোনো বিরোধিতা হয় নি। এমতাবস্থায় বিষয়টি শুরু করার জন্য এই সময়টি খুবই উপযুক্ত তা সবাই মনে করেছেন।

প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা এক্ষেত্রে দুটি মিলে গেছে । তবু সারা রাজ্যে এ মূল্যায়ন ধারা সঠিকভাবে প্রচলন করতে গেলে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা যে ভীষণই অপ্রতুল তা সবাই মনে করেন। তাই রূপায়ণের দৃষ্টিভঙ্গিটিকে মাথায় রেখে বর্তমান কমিটি নিম্নে কিছু সুপারিশ করেছেন। **এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো কোনো মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে ভিন্ন ধরণের সুপারিশ এসেছে। যদিও সমগ্র কমিটির গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রেখে একটি সাধারণ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। তবু উপরিউক্ত মাননীয় সদস্যদের মতামতকেও সবার গোচরে আনা হল। এই কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী সুনন্দ সান্যাল এবং অন্যতম সদস্য যোগেন চৌধুরি মহাশয়ের মতামত দুটি আলাদাভাবে রিপোর্টের শেষে Anexture I & II হিসাবে সংযুক্ত হল। (পৃষ্ঠা নং ১২১ ও ১২৩)**

১.৭.১. প্রাথমিকস্তরে **চতুর্থ শ্রেণির পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 'আটকে না রাখার নীতি' গ্রহণ** করা যেতে পারে; তবে সে ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষকই শিখনমানে দুর্বল শিশুকে পরবর্তী শ্রেণিতে তুলে দিতে পারবেন না। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার আনতে হবে নিম্নলিখিতভাবে :

(ক) **প্রাথমিকে সব শ্রেণিতেই সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নকে** সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এমনকি পঞ্চম শ্রেণিতেও এই মূল্যায়ন চালু রাখতে হবে। কমিটি মনে করেন এ মুহূর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে মূল্যায়নধারা বজায় আছে তা CCE প্রক্রিয়াকে যথাযথ গ্রহণ করে নি এবং প্রথাগত পরীক্ষাপদ্ধতিকেও পুরোপুরি ত্যাগ করে নি। এই আধাখ্যাঁচড়া জাতীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ত্যাগ করে সঠিকভাবেই CCE প্রচলন করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও পঞ্চম শ্রেণিতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে সঠিক CCE র প্রকরণ বুঝে নিতে হবে। নয়া পাঠক্রম চালু হলে ২০১৩ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতে ১ :৩৫ হারে শ্রেণিবিভাজন, প্রতিটি বিভাজন অনুযায়ী শিক্ষক, নতুন পাঠক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক এবং অনুসারী সামগ্রির ব্যবস্থা করবেন সরকার। প্রতিটি বিদ্যালয়কে এই ভাবে গড়ে তোলার জন্য অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (S.I. of School) সহ স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত নির্দেশ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে। অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণিতে কর্মরত শিক্ষকদের বিস্তৃত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে ২০১২ সালের মধ্যেই।

(খ) মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে বড়োদের/শিক্ষকদের উদ্বেগ অনেক সময় শিশুকে ভীত করে তোলে। কোনো চাপ না থাকলে শিশুরা মূল্যায়নে বসতে যে ভীষণ আগ্রহী তা বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি Centre for Studies in Social sciences, Calcutta র উদ্যোগে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তার ফলাফল 'Low mean & High variance: Quality of Primary education in Rural West Bengal' প্রতিবেদনে (লেখিকা- জ্যোৎস্না জালান এবং ঝর্না পান্ডা) বিধৃত হয়েছে। এই রিপোর্টে উল্লেখ আছে, " No student displayed any fear or anxiety in taking test"। সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁরা হঠাৎ এই অভীক্ষাগুলি চালিয়েছিলেন শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে। বিপরীতে বরং দেখা গেছে ওদের মধ্যে উৎসাহ এবং ফলাফল জানার আগ্রহ। RTE অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে "প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ না হওয়া অবধি কোনো শিশুকে ফেল করানো বা বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা যাবে না"। তাই কমিটি মনে করেন, নিজের সাফল্য সম্পর্কে ধারণা করা এবং অসাফল্যের মাত্রা ও কারণ জেনে নিজেকে শুধরে নেওয়া শিশুর অধিকারের মধ্যে পড়ে। পরবর্তী জীবনের জন্যও এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি সামর্থ্য। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবেই, তবে তা হবে চাপহীন এবং উদ্বেগশূন্য। **মূল্যায়নের আনুষ্ঠানিকতা বাদ** দিয়ে শিশুর জন্য একটা স্বাভাবিক পরিকল্পনা করতে হবে। সেখানে মূল্যায়নের তারিখ এবং ফলাফল ঘোষণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করেন না।

(গ) তবে কমিটি মনে করেন সারাবছরে শিশুর জন্য **দুটি পার্বিক মূল্যায়ন থাকবে। আর একটি হবে সামগ্রিক মূল্যায়ন,** এটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গ্রহণ করবেন। শিক্ষকরাই শিশুকে অনেক ভালভাবে বিচার করতে পারবেন। সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ধাঁচে পার্বিক মূল্যায়নগুলি হবে মূলত লিখিত পরীক্ষার মত। তবে মূল্যায়নপত্রগুলি শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের সময় যে ধরনের সমস্যা নিয়ে শিশুরা কাজ করেছে সে রকম সমজাতীয় সমস্যা মূলত বোধ ও প্রয়োগের সামর্থ্য নিরূপক অভীক্ষা পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করা হবে। পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি মুখস্থ করে

তার উত্তর দেওয়া যাবে না; অন্যদিকে শিশু কতটা বুঝেছে, কীভাবে বুঝেছে বা কীভাবে প্রয়োগ করতে চাইছে এই process-based understanding কেও মর্যাদা (credit) দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। লিখিত পরীক্ষার পরিসরের মধ্যেই product এবং process নির্ভর প্রশ্নপত্র নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। চক্রসম্পদ কেন্দ্র (CLRC) কে এই কাজটি বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ক্রমাগত এই ধরনের অভীক্ষাপত্র নির্মাণের চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তাই কোনো প্রথাগত বহির্মূল্যায়ন থাকবে না। তবে **সমীক্ষা ও মেধা অন্বেষণের উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ উদ্যোগ** নেওয়া হলে তা অনুষ্ঠিত করায় কোনো সমস্যা আছে বলে কমিটি মনে করেন না। এই ধরনের সমীক্ষা সব শিশু বা বিশেষ কিছু শিশুকে নিয়ে করা যেতে পারে। এর ফলাফলের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পাশ-ফেলের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সমীক্ষা ও মেধা অন্বেষণের ফলাফল সমীক্ষক কর্তৃপক্ষ বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন । এই নীতিটিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ চতুর্থ শ্রেণির শেষে পুনরায় কোনো মেধা অন্বেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। 'মেধার বিকাশ' টিকে RTE তে জোর দেওয়া হয়েছে। ২৯ নং ধারার ২ এর (গ) উপধারায় "শিশুর জ্ঞান ক্ষমতা ও মেধার বিকাশ" কে নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। অতএব বিগত কয়েক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে 'মেধা' র অবনমনকে কমিটি সমর্থন করছেন না বরং মেধাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ এর প্রক্রিয়ায় মেধার প্রতি শিক্ষাব্যবস্থার দৃষ্টি ও নজর কেই তুলে ধরার ব্যবস্থা হলে কমিটি তাকে স্বাগত জানাবে। অন্য দিকে প্রতিটি গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে যদি বছরে অন্তত একবার বিদ্যালয়টির সার্বিক সমীক্ষা হয় এবং ঐ সমীক্ষায় যদি শিশুর শিখনমান নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকে তবে ঐ সমীক্ষাটিও কমিটি স্বাগত জানাবে। ঐ ফলাফলের ভিত্তিতে যোগ্য শিশুদের সম্মানিত করার ব্যবস্থা চক্রসম্পদকেন্দ্রে করা হলে তা মেধা বিকাশের পথ আরও সুগম করবে।

(ঙ) প্রতিটি মূল্যায়ন শেষে একবার করে অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। শিশুদের যা কিছু সাফল্য তাই সেখানে আলোচনা করতে হবে । ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব যে বিদ্যালয়ের, সে বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করতে হবে। শিশুর প্রতি কোনো আচরণ সম্পর্কে অভিভাবক/অভিভাবিকাদের যদি কিছু বলার থাকে তা আলোচনার মাধ্যমে এবং মতামত আদানপ্রদানের মাধ্যমে যৌথসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের কৃত্যালি দিয়ে সম্ভব নয়। অভিভাবকদেরও এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

(চ) এ সূত্র ধরেই বর্তমানে চালু 'গ্রেড' প্রথা থাকবে কিনা তা নিয়েও আলোচনা হয়। এই আলোচনায় দেশ-বিদেশে যেখানে গ্রেড প্রথা চালু রয়েছে সেখানকার উদাহরণ টানা হয়। শেষে সবাই একমত হন যে, যেভাবে গ্রেড ও নম্বর দুটি প্রথাই চালু আছে তাতে এই ব্যবস্থাটির উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে নম্বর পদ্ধতিটি কিছুটা দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় সচেতন অভিভাবকরাও শিশুদের ফলাফল স্পষ্ট বুঝতে পারেন না । শিশুদের সফল্যে তারতম্য থাকবে। তা স্পষ্টভাবে জানানো এখন দরকার বলে কমিটি মনে করেন। ৪০ শতাংশের নীচে যারা নম্বর পাবে,তারা যে খুবই দুর্বল তা শিক্ষক ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের উচিত হবে ঐ সমস্ত শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বরের বেশি তুলতে পারার সমর্থ করে তোলা। এ ব্যবস্থাটি শুধু গড় নম্বরের ভিত্তিতে করলে চলবে না, প্রতিটি বিষয়েই তার সাফল্যের নিরিখ হবে এটি। তাই কমিটি মনে করেন নম্বর পদ্ধতি বাদ দিয়ে যদি Grade-point Average পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা যায়, তবে 100 Point grading সহ **পুরানো নম্বর পদ্ধতিকেই ফিরিয়ে আনা উচিত** হবে।

(ছ) অন্যদিকে, প্রতিদিনই পাঠ ও কৃত্যালিকে সামনে রেখে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CCE) করতে হবে। বিশেষত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিশুটিকে বোঝার জন্য নিয়মিত এ ধরনের মূল্যায়ন প্রয়োজন তা মনে রাখতে হবে। CCE হবে প্রতিদিনের কাজ। CCE র জন্য নির্ধারিত কোনো তারিখ না উল্লেখ করে পঠন- পাঠন চলাকালীনই তা গ্রহণ করতে হবে। যে যে কাজের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন গৃহীত হল তার নথি সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক প্রতিটি শিশুর জন্য Report card এর ব্যবস্থা রাখবেন এবং এই

নথিটি শিশুর বিষয় জ্ঞান এর চেয়েও সামর্থ্যের মান নির্ণয়ে বেশি সাহায্য করবে। যে কোনো পাঠ-একক শুরুর আগে পূর্ববর্তী পাঠের অভীষ্ট মান শিশুর পক্ষে অর্জন সম্ভব হয়েছে কিনা তা দেখে নিতে হবে Report Card অনুসারে। এই কারণে **শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজের একটি 'ডায়েরি'** নির্দিষ্ট রাখবেন যাতে শ্রেণির চালচিত্র সারা বছর ধরে নথিবদ্ধ হতে থাকে। **মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র হুবহু পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে রচিত হবেনা** বরং সমজাতীয় সমস্যা ও অভীষ্ট সামর্থ্যকে মাথায় রেখে রচিত হবে। স্থানীয় সম্পদকেন্দ্রগুলিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আরও সমর্থ করে তুলতে হবে যাতে তারা অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিতে মূল্যায়নের সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন। পাঠ চলাকালীন যে সমস্যাগুলি শিশু নিজে সমাধানের চেষ্টা করেছে এবং C C E এর মাধ্যমে যে সমস্যার মোকাবিলা করেছে, তারই অনুরূপ নতুন কোনো সমস্যা দিয়ে ঐ মূল্যায়নগুলি অনুষ্ঠিত করতে হবে, যাতে এর মাধ্যমে শিশু নিজেই কতটা শিখতে পেরেছে তার প্রমাণ রাখতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে শিশুর সামগ্রিক সাফল্য নির্ধারণ করা হবে তার C C E তে অংশগ্রহণের মান, বিভিন্ন কৃত্যালিতে অংশগ্রহণের সাফল্য এবং তিনটি বড়ো মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে। প্রতিটি শিশুর জন্য রিপোর্ট কার্ডটিকে যত্ন সহকারে নির্মাণ করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণির জন্য একজন করে শ্রেণি-শিক্ষক ব্যবস্থা চালু থাকবে। ঐ শিক্ষকের নেতৃত্বে ঐ শ্রেণির সমস্ত প্রকার মূল্যায়ন ও কৃত্যালি অনুষ্ঠিত হবে এবং তার নথি রক্ষিত হবে।

(জ) কোনো বিজ্ঞানের শ্রেণিকক্ষেই পঠন-পাঠনের সময় সরাসরি সমাধান দানের ব্যবস্থা থাকবে না; বরং পর্যবেক্ষণ ও ছোটো ছোটো কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে ধারণাকে বলিষ্ঠ করার কাজ, অনুমান ও অন্বেষণের মাধ্যমে ছোটো ছোটো মডেল ও Project গ্রহণ এবং দলগতভাবে ও নিজে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে দৃঢভাবে বলবৎ করতেই হবে। শিশুর মূল্যায়ন এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানের উপরে হবে। না বুঝে **মুখস্থ করার কোনো সুযোগ প্রাথমিক স্তর থেকেই বর্জন** করতে হবে বলে কমিটি মনে করেন।

(ঝ) **প্রাথমিকে মূল্যায়নে ৫০ ভাগ জোর থাকবে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর এবং বাকি ৫০ ভাগ থাকবে পার্বিক এবং সামগ্রিক লিখিত মূল্যায়নের উপর** । শিশুর পঠন-পাঠন সংক্রান্ত সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার বাইরে শিশু কতটা নিজস্ব সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে কোনো সমস্যা সমাধানে সমর্থ হচ্ছে তা বিচার করা হবে। সেইমত তার জন্য পাঠ-পরিকল্পনা ও কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-এর বিচার করতে ঘুড়ি ওড়ানোর মত খেলাকে ব্যবহার করা যায়। যদি দেখা যায় শিশু ঘুড়িটিকে খুব সহজেই সবার চেয়ে ভালভাবে ওড়াতে পারছে, অথচ গণিতের সমস্যা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারছে না তবে বুঝতে হবে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনো সমস্যা নেই। বরং সমস্যা সমাধানের আগে গণিতের সমস্যাটিকেও খেলাচ্ছলে বাস্তব সমস্যা হিসাবে দেখিয়ে শিশুটিকে সমাধান করতে দিতে হবে। গল্প, ম্যাজিক এবং মজার মজার গাণিতিক ধাঁধা দিয়ে তাকে তার সমাধান করতে বলতে হবে। নিখুঁত সমাধানের উপর সমস্ত জোর না দিয়ে শিশু কীভাবে সমাধান করতে চেয়েছে তা গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেইমত মূল্যায়নে তার মান যাচাই করতে হবে। মান যাচাই এর জন্য মূল্যায়নপত্রগুলি এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিশু কীভাবে সমাধান করল, তার চিন্তন প্রক্রিয়া, তার যুক্তি বিচারবোধ মূলত তার Process of thinking & reasoning ও যেন ধরা পড়ে। 'Process এবং output' উভয় বিষয়ই এই পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে। জ্ঞান-নির্মাণ (Knowledge Construction) প্রক্রিয়াটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ঞ) মূল্যায়নের এই রকম ধারা পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয়। তবু সবার লক্ষ্য ঐ দিকে রাখতে হবে। কমিটি মনে করেন কোনো না কোনো সময় এই প্রক্রিয়া শুরু করতেই হবে। তাই RTE র প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টিকে এখনই শুরু করা প্রয়োজন। এজন্য রাজ্য, জেলা এবং চক্র (CLRC) স্তরে **বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে দল গঠন** করতে হবে। প্রতি নিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যায়নে অভিনব কৌশল নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলাফলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন কেও।

(ট) RTE কার্যকর করতে যাদের বয়স অনুসারে ভর্তি করা হচ্ছে অথচ যারা শিখনমানে যথেষ্ট পিছিয়ে তাদের জন্য প্রতিদিনই শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন শেষে কিছুটা করে সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে। এমনকি বছরের শেষে একমাস নিবিড়ভাবে কাজ করে পুনরায় মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের আরও একবার সামর্থ্য যাচাই করতে হবে এবং উপযুক্ত করে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের সীমাটিকে মাথায় রাখতে হবে।

(ঠ) দ্বিতীয় ভাষা **ইংরাজির শোনা-বলা-কথোপথন বিষয়ক সামর্থ্য বিকাশকে** খুবই জোরের সঙ্গে বিবেচনা করতে সুপারিশ করছেন কমিটি। এক্ষেত্রে কীভাবে তা করা হবে সেগুলি অন্য অধ্যায়ে বর্ণনা করা আছে। তবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ নম্বর এই কাজে ব্যবহার করতে সুপারিশ করা হয়েছে।

১.৭.২ উচ্চপ্রাথমিকে স্তরে বর্তমানে প্রচলিত **'ইউনিট টেস্ট' প্রথা বন্ধ করাই উচিত** বলে কমিটি মনে করেন। এই পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র নিতান্তই জ্ঞানমূলক। ফলে বোধ বা প্রয়োগের সুযোগ এখানে নেই। ক্যুইজের মত মুখস্থ করে শিশুরা পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়। শিক্ষকেরাও সারা বছর শুধুই খাতা দেখায় ব্যস্ত থাকেন। পরীক্ষার চাপ বাড়ায় প্রাইভেট টিউশনের উপর আরও ঝোক বেড়েছে বলে কমিটি মনে করেন। তাই প্রাথমিকের মত উচ্চ প্রাথমিকের সব শ্রেণিতে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সহ দুটি পার্বিক ও একটি সার্বিক মূল্যায়ন চালু হোক এটা কমিটি মনে করেন। সঙ্গে সঙ্গে **গ্রেডিং প্রথার বিলোপ করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আটকে না রাখার ব্যবস্থা** প্রচলিত হোক তাও কমিটি চায়। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে এই মুহূর্তে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষে নয় কমিটি বরং সেটি **ধাপে ধাপে চালু হোক কমিটি এটি সুপারিশ** করতে চাইছেন । ২০১৩ সালে আশা করা যায় পঞ্চম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক চালু হবে। ইতিমধ্যে সরকারকেও প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ১:৩৫ এই হারে শিক্ষক নিয়োগ, পঞ্চম শ্রেণির সেকশন বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ সেরে ফেলতে হবে। এই দুটি ব্যবস্থার আয়োজন জেলাস্তরে গড় হিসাবের প্রেক্ষিতে সমাধা করলে চলবে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে যাতে তা প্রত্যক্ষ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে অন্তত ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পঞ্চমশ্রেণির অনুকূলে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও আটকে না রাখা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। ২০১৩ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথার অবসান ঘটিয়ে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের সঠিক প্রচলন শুরু করা যেতে পারে। এরপর ধাপেধাপে ২০১৬ সালে অষ্টম শ্রেণিতে ঐ ব্যবস্থা কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমনভাবে আবেদন করতে হবে যাতে তাঁরা এই ব্যবস্থাপনাটি সঠিকভাবে রূপায়ণ করার জন্য এ রাজ্যকে আরও ২-৩ বছর বাড়তি সময় দেন । বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ যতদিন না এই ব্যবস্থার সঠিক রূপায়ণে সমর্থ হয়ে উঠছে তত দিনই এই ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষে নয় এই কমিটি। পূর্ববর্তী সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের ফল সবার জনা। এটির পুনরাবৃত্তি হোক তা কমিটি চায় না। এই পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষাগুলির মোট নম্বর সামগ্রিক নম্বরের ৬০% এর বেশি হবে না। বাকি ৪০% ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও অন্যান্য কৃত্যালিতে সংযুক্ত করতে হবে।

১.৭.৩. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই মূল্যায়ন ধারায় আমূল পরিবর্তন কার্যকর করতে স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (SIS) দের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি চক্রসম্পদ কেন্দ্রকে সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য দিয়ে সামর্থ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি চক্রসম্পদ কেন্দ্রকে আয়তনে আরও ক্ষুদ্র করে ফেলতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে কয়েকজন Resource Teacher কে নিযুক্ত করে তাদের এ ব্যপারে যথেষ্ট গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দিতে হবে। কমিটি বিশ্বাস করেন সমস্ত এলাকাতে এমন অনেক চিন্তাশীল শিক্ষক আছেন যাঁরা এই কেন্দ্রগুলিতে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দান করতে পারেন। তাঁদের বাছাই ও নিয়োগের শর্তগুলি সরকার ঠিক করে দেবেন। চক্রসম্পদ কেন্দ্রের দলটি বছরে অন্তত একবার প্রতিটি বিদ্যালয়ে হঠাৎ হাজির হয়ে সমস্ত শিশুদের উপর পূর্ব-পরিকল্পিত অভীক্ষাপত্র প্রয়োগ করে সমীক্ষা চালাতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কৃত্যালিরও ব্যবস্থা করতে পারবেন। এই অভীক্ষাপত্রগুলি বিভিন্ন সমীক্ষায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়ে ছিল সেইভাবে তৈরি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তার ভিত্তিতে CLRC প্রতিটি শ্রেণি ও বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি বিবরণ প্রকাশ করবেন। এতে শিক্ষকের কাজের মান ও বিদ্যালয় পরিচালনার মান নির্ধারিত হবে। একই সঙ্গে কোন বিদ্যালয়ের কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তারও একটি রূপরেখা পাওয়া সম্ভব হবে।

১.৭.৪. দশম শ্রেণির অন্তভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দুটি বছরের পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়, অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিকও তাই। কমিটির সদস্যবর্গ বিভিন্ন ছাত্র/ছাত্রীরা ও শিক্ষকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখছেন। দশম শ্রেণির প্রান্তে মাধ্যমিক পর্ষদ আয়োজিত রাজ্যব্যাপী একই পরীক্ষা একসঙ্গে থাকায় শিক্ষার্থীদের সমস্ত ঝোঁক চলে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার দিকে। পশ্চিমবঙ্গের বাবা-মায়েরাও এই পরীক্ষাটির বিষয়ে ভীষণই সংবেদনশীল। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে। ফলে এই দুটি বছরে সবার লক্ষ্য থাকে কীভাবে নম্বর বাড়ানো যায় তার দিকে। মাধ্যমিকে পরীক্ষাপত্রগুলি সেক্ষেত্রে সমস্ত পরিকল্পনার অভিমুখ হয়ে যায়। তিন ঘন্টার ঐ পরীক্ষাপত্রের মাধ্যমে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের বিষয়টিও খুব বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নয়। অন্যদিকে নবম শ্রেণিকে দশম শ্রেণির সঙ্গে সংযুক্ত করারও কোনো অর্থ নেই। নবম মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হলে নবমের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি কয়েকটি সম্ভাব্য পরীক্ষাপত্রে পরিণত হয়ে যায়। একই প্রশ্ন বা পাঠ-একক কে ১/২ বছর অন্তর অন্তর পুনরায় পরীক্ষাপত্রে আনার রীতি মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রবল। ফলে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির উপর পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া যেমন পরিচালিত হয়, তেমনি বিভিন্ন কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Suggestions)বা টেস্ট পেপার প্রকাশন চলতে থাকে। এখানেও একই মানসিকতা কাজ করছে যে শিক্ষার্থীরা আগে থেকে চর্চা না করলে এই পরীক্ষায় খারাপ ফল করবে। তাই প্রশ্নপত্রের ধরণ সম্পর্কে যথাসম্ভব অবহিত করানোর একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর ফলে ঐ সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে সারা বাজার নেমে পড়ে অন্য এক ভূমিকায়। অহেতুক অজস্র পুস্তকের চাপ সহ্য করতে হয় শিক্ষার্থীকে। প্রাইভেট টিউশনের প্রসার বাড়তে থাকে। অথচ নম্বর এর সাথে সাথে ৯ পয়েন্ট গ্রেড (9 point grade) এ শিক্ষার্থীকে বিচার করার ব্যাপারটিও স্পষ্ট নয়। এটি একটি অর্থহীন ব্যবস্থায় পরিনত হয়েছে চালু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাই বর্তমান কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করছেন :

(ক) নবম-দশম শ্রেণিতে **বিভাজিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি** থাকাই যুক্তিযুক্ত।

(খ) **নবম শ্রেণিতে সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের** ধারা উচ্চ প্রাথমিকের মত চালু করা প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র নির্মাণটিকেও উচ্চ প্রাথমিকের মত করা দরকার। অনুরূপভাবে দুটি পার্বিক ও একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন নবম শ্রেণিতে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। **দশম শ্রেণির শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকবে।** মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধাপে ধাপে পরিবর্তন ঘটাতে হবে ২০১৮ সালের মধ্যে। পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর বোঝার ক্ষমতা ও প্রয়োগের দক্ষতার উপর আস্থা রাখতে হবে। না বুঝে মুখস্থ করে নম্বর তোলার প্রক্রিয়াটিকে বর্জন করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এমন ৫/১০ বাক্যের লিখিত উত্তরকে জোর দিতে হবে এই পরীক্ষায়। প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ না পেলে যে পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না তাও সুনিশ্চিত করে জানিয়ে দিতে হবে পঠন-পাঠন চলাকালীন। যেহেতু প্রতিটি বিষয়েই অন্তত পক্ষে শতকরা ১৫ নম্বর থাকবে হাতানাতে কাজ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কর্মসূচিতে (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া, নান্দনিক কাজ সহ ২০ শতাংশ) তাই যে কোনো নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীর পক্ষেই এই ন্যূনতম নম্বর তোলা কঠিন হবে না বলে কমিটি মনে করেন।

(গ) সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য Project work, ICT র ব্যবহার, Labaratory র ব্যবহারের মাধ্যমে হাতেনাতে কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ানো, এছাড়া চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, থিয়েটার, ফিল্ম স্টাডি, বিতর্ক সভা পরিচালনা, খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার ব্যবস্থা এবং কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার জন্য গ্রাম/শহরের কোনো অঞ্চল নির্বাচন করে সেখানে নিবিড়ভাবে সমীক্ষা সহ অনু-পরিকল্পনার কাজ করা, Mock পঞ্চায়েত, Mock বিধানসভা এবং বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি ও শারীরিক চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক ধারণা ও কৃত্যালি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এটির নম্বরও মাধ্যমিকের Marksheet এ যুক্ত হবে। তবে তা সমগ্র নম্বরের ২০ শতাংশের বেশি নয়।

(ঘ) **নম্বর এবং Grade একসঙ্গে রাখার কোনো যুক্তি নেই,** বরং যতদিন না Grade-Point Average ব্যবস্থা চালু হচ্ছে ততদিন পুরানো নম্বর প্রথা পুনরায় চালু করার পক্ষে সুপারিশ করছেন কমিটি। তবে এক্ষেত্রে সমস্ত শিশুকে

প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে সাহায্য করতে হবে। এখানে তৃতীয় ভাষার নম্বরটি প্রগতিপত্রে উল্লিখিত হবে। তবে ব্লকস্তরে বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করতে হবে।

(ঙ) পরবর্তীকালে বিভিন্ন শাখা (Discipline) নির্বাচনের সুবিধার্থে কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয়েরও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সেগুলিতে প্রাপ্ত নম্বরটিকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে বলে কমিটি মনে করেন।

(চ) দশম শ্রেণিতেও একই রকম ব্যবস্থা থাকবে। শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষার marksheet এ উপরে 'গ' এ উল্লিখিত ২০% নম্বর এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরটিও যুক্ত করতে হবে। মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র যতটা সম্ভব পাঠ্যপুস্তক-নিরপেক্ষ করতে হবে। শিশুটিকে এমনভাবে পঠন-পাঠনে যুক্ত করতে হবে যে তার শেখার বিষয়টি যেন পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে।

(ছ) নবম ও দশম শ্রেণিতে আলাদা করে পরিবেশবিদ্যা পড়ানোর প্রয়োজন নেই। কারণ নতুন পাঠ্যক্রমে জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস এই চারটি বিষয়কে পরিবেশ বিদ্যার আঙ্গিকে ভাবা হয়েছে। কয়েকটি অধ্যায়ে পরিবেশকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১.৭.৫. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়ে কমিটি এখনো পর্যন্ত গভীরভাবে মানোনিবেশ করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে COBSE র নির্দেশ মত বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। চূড়ান্ত বিবরণ পেশের সময় এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা যাবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৮. বাড়ির কাজ ও প্রাইভেট টিউশন : বর্তমান কমিটির কাছে আরও একটি বিষয় বিতর্কের সুচনা করেছে তা হল "বাড়ির কাজ"। বর্তমানে প্রাথমিকে Home work (বাড়ির কাজ) দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু তা চালু আছে। উচ্চপ্রাথমিকে এই ব্যবস্থাটি পুরোপুরি প্রচলিত। বাড়ির কাজ আবার তথাকথিত 'ভালো বিদ্যালয়ের' অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। সচেতন পিতামাতারা বাড়ির কাজ দেওয়াকে শিশুর শিখনের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা মনে করেন। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকস্তরে এমন অনেক বেসরকারি বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে যেখানে শ্রেণিকক্ষে যা কাজ করানো হয় তার চেয়ে অনেকগুণ কঠিন পড়া বাড়ির কাজ হিসাবে করতে দেওয়া হয়। বর্তমান কমিটি খতিয়ে দেখেছেন যে বাড়ির কাজের মধ্যে বেশির ভাগটাই স্মৃতিনির্ভর। কিয়দংশ অনুশীলনীর কাজ। পাঠ্যবইএ সংযোজিত অনুশীলনীকে বাড়িতে সম্পূর্ণ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। বেশিরভাগ শিশু শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে বা প্রয়োগ করতে পারে না বলে তারা বাড়িতে সেগুলি ঠিকভাবে করে উঠতে পারে না। বাড়ির কাজ ভুল হলে শিশুদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের ভয় থেকে যায়। তাই তারা বাড়ির কাজের মূল্যায়নের দিনে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। অন্যদিকে শিশুদের অসহায়তা দেখে পিতা-মাতা প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করেন। প্রতীচী ট্রাস্টের শিক্ষা প্রতিবেদন ২-এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি সমৃদ্ধ বিবরণ দেওয়া আছে। তাঁরা দেখিয়েছেন গত ৬ বছরে বিদ্যালয়গুলির মত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও প্রাইভেট টিউশনের ঝোঁক প্রায় ৩৮% বেড়েছে। অথচ তাঁরা এটিও উল্লেখ করেছেন যে যারা প্রাইভেট টিউশনি নেয় তাদের মধ্যে অনেক শিশুই ন্যূনতম ভাষা ও গণিতের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। এখান SCERT এর গবেষণায় একই চিত্র ধরা পড়েছে। অন্যদিকে সরকারি পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে প্রাথমিকস্তরে 'ছাত্রবন্ধু' নামে বিভিন্ন সহযোগী বই-এর ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে অনুশীলনীর অংশ যেখানে বিশালভাবে সংযোজিত সেটি 'ভালো বই' হিসাবে বিবেচিত হয়। এগুলি সবই শেষে শিশুর কাছে 'বাড়ির কাজ' হিসাবে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে শিশুর অসহায়তার সূত্র ধরে চলে আসে প্রাইভেট টিউশন। তবু আশার কথা যে গত কয়েক বছরে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পেশায় যারা আছেন তাঁদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনি করার প্রবণতা কমেছে। RTE তে স্পষ্ট নির্দেশ থাকায় এই প্রবণতা হয়ত আরও কমবে। কিন্তু অন্যদিকে সমস্যাটি আরও গভীর হয়ে উঠছে। যেহেতু পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজনীয়তা দূর করা যায় নি, তাই ঐ শূন্যস্থান পুরণ করতে এগিয়ে আসছে বেকার

যুবক-যুবতীরা। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে অল্পশিক্ষিত এবং যে শ্রেণির শিশুদের পড়ান তাদের পড়ানোর যোগ্যতা তাঁদের নেই। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যাটি খুবই প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে শ্রেণিকক্ষে শিখন ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রাইভেট টিউটার ভুলভাবে কোনো বিষয় শিশুকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে আর একটা সমস্যা হচ্ছে শিশুর নিজের কিছু করা, এমনকি ভুল করার অধিকারও খর্ব হয়ে গিয়েছে। প্রাইভেট টিউটারের অবৈজ্ঞানিকভাবে শিশুকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শিশুটিকে পড়াশুনায় ভীত এবং নিজের সম্পর্কে হীন মনোভাবাপন্ন তুলেছে।

বর্তমান কমিটি SCERT এবং প্রতীচীর শিক্ষা প্রতিবেদন ২ এর সাথে একমত এবং এটা মনে করেন যে প্রাথমিকস্তরে বাড়ির কাজ দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ হল :

১.৮.১. শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির **পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা** করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত **চারঘন্টা** তাদের অর্থবহভাবে শিখনের কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে। **পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষেই রক্ষিত থাকবে।** প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ হবে প্রশস্ত এবং সেখানে শিশুদের কাজের এবং বিনোদনের উপযোগী বিভিন্ন উপাদান রক্ষিত থাকবে। ছবি সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা দিয়ে একটি গ্রন্থাগারও বানানো যেতে পারে। ২০০ দিন ৪ ঘন্টা ধরে পঠন-পাঠন চললে বছরে একটি শিশু ৮০০ ঘন্টা শিখনের কাজে ব্যাপৃত থাকবে। ফলে এক্ষেত্রে তার জন্য আর অতিরিক্ত পাঠের (বাড়ির কাজ) ব্যবস্থা করা দরকার হবে না। এই ৪ ঘন্টা ব্যবহারে যদি বিদ্যালয়ে কোনো ত্রুটি থাকে তার বিচার করতে হবে RTE নির্দেশিত অনুশাসন অনুযায়ী।

১.৮.২. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে প্রতিদিন ৫ ঘন্টা পঠন-পাঠন সহ অন্যান্য কৃত্যালিতে ব্যবহার করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর ধারাবাহিক মূল্যায়নও শেষ করতে হবে। শিশুর ঘাটতি পূরণও করে ফেলতে হবে এই সময়ে। যেহেতু সময়সারণিতে যথেষ্ট নমনীয়তা থাকবে তাই শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে বাড়তি সময় ব্যবহার করতে পারবেন । এখানেও তাই **'বাড়ির কাজ' দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।** তবে কোনো কোনো দিন কোনো কোনো বিষয়ে শিশুর শিখনকে আরও সুগঠিত করতে শ্রেণিকক্ষের ধারা অনুসারে সমজাতীয় কাজ দিতে পারেন। তবে তা কখনই স্মৃতিনির্ভর ও অধিকতর কঠিন হবে না এবং তা ১ ঘন্টার বেশি হবে না। এক্ষেত্রে **বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট আবেদন পিতামাতার কাছে প্রচার করতে হবে যে, শিশুর পড়া-শোনার দায়িত্ব একটি বিদ্যালয়ের তাই তার শিখনের জন্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থার উপর তাঁদের ভরসা করে দেখতে হবে। শিশুর কাজ শিশু নিজেই করবে তাই তাকে সাহায্য করা বা টিউশনিতে পাঠানো তার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। এই আবেদনটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা নিতে হবে।** মা বাবাদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখা এই ব্যবস্থার অন্যতম।

১.৮.৩. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য 'বাড়ির কাজ' যেন ২ ঘন্টার বেশি না হয় তা দেখতে হবে। প্রাথমিকের মত অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। Project নির্ভর কাজগুলি বাড়ির কাজের জন্যে দিলে শিশু নিজেই তা করতে পারবে। এক্ষেত্রে Computer Aided Learning (CAL) প্রয়োগ করে 'বাড়ির কাজ' দেওয়া হলে শিশুরা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করে এই কাজগুলি শেষ করতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, বিকল্প সিদ্ধান্ত, অভিনব উপায় আবিষ্কার, practical book তৈরি করা এবং সর্বোপরি নিজস্ব মতামত লিখে আনার মত বিভিন্ন কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে।

১.৮.৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে বাড়ির কাজ দেওয়া যেতে পারে তবে তা মুলত project based কাজ হবে। Computer aided কৃত্যালিগুলিকে এখানে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষকদের উচ্চ প্রাথমিকের মত প্রয়োজনীয় কৃত্যালি তৈরি করতে হবে । শিক্ষক প্রশিক্ষণে 'বাড়ির কাজ' তৈরির যাবতীয় কৃৎকৌশল শেখানো যায়। বাড়ির কাজের নমুনা তৈরিতে স্থানীয় চক্রসম্পদ (CLRC) কেন্দ্রকে দায়িত্ব দিতে হবে। সরকার এ বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় পুস্তিকাও প্রকাশ করতে পারেন। মূল্যায়নে অভিনবত্ব আনলে প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজনীয়তা কমবে বলে বর্তমান কমিটি মনে করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের পার্বিক মূল্যায়ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়নে পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করে প্রশ্নপত্র দেওয়ার পদ্ধতি বদল করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে যেভাবে শিশু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে শেখে তেমনিভাবে অনুরূপ চ্যালেঞ্জ দিতে হবে বাড়ির কাজে এবং

তার সামর্থ্য গড়ে উঠেছে কিনা দেখতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলির প্রকৃতি ও প্রকরণ প্রতিবারেই অভিনব করে দিতে হবে।এই কাজটিতে রাজ্য থেকে জেলা ও CLRC Level পর্যন্ত দল গড়া প্রয়োজন। Psychometry এবং Psychology র গবেষকদের এই কাজে যুক্ত করে মূল্যায়নের প্যাটার্নগুলিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবে শিশুদের বিপদের মধ্যে ফেলা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং শ্রেণিকক্ষে পঠন পাঠনের ধারা বদলানো এবং মূল্যায়নকে আরও বেশি শিশুর সামর্থ্য নিরূপক করাই এর উদ্দেশ্য। অন্যদিকে এই অভিনব প্যাটার্নের ফলে মূল্যায়নের আগে শিশুদের কোনো প্রাক্ প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। তাই কোনো চাপ ছাড়াই আনন্দের সঙ্গে এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে। মূল্যায়নে যেহেতু শিশুর চিন্তন পদ্ধতি এবং তার যুক্তিপ্রদানের ধারাগুলিকেও বিচার করা হবে তাই শিশু যে কোনো উত্তরে তার মতো করে নম্বর পেতে পারবে। ফলে সামগ্রিক ফলাফলও খারাপ হবে না এবং শিশুর অসহায়তা অনেকাংশে কেটে যাবে। প্রাইভেট টিউশনেরও আর তেমন কোনো প্রয়োজন হবে না বলে কমিটি মনে করেন। এই ভাবে প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে নতুন পাঠক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করেন।

১.৮.৫. অন্যদিকে প্রাইভেট টিউশনের ঝোঁক কমাতে শিশুর মধ্যে এক বীতরাগ গড়ে তুলতে হবে। বাড়িতে শিশু যাতে কারুর কাছেই সাহায্য নিতে না চায় এবং সাহয্য না নিয়েই নিজের কাজটি করে ফেলতে চায় তার অনুকূলে পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে।

১.৮.৬. বরং বিকল্প হিসেবে “সহযোগী শিখন সম্ভার” কে শিশুর কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। বাবা-মাকে সভা করে বোঝাতে হবে প্রাইভেট টিউশনের পরিবর্তে সহযোগী ‘শিখন সম্ভার’ কিনে দিলে শিশুর লাভ অনেক বেশি হবে।

১.৯. শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার : এ বিষয়ে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করতে চেয়েছেন :

১.৯.১. শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যেই সমস্ত শ্রেণিতে দৃশ্য-শ্রাব্য প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এ সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিদ্যালয়গুচ্ছস্তরে এক একজন শিক্ষক/শিক্ষিকার মাধ্যমে অন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে এই দক্ষতাটিকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে সঞ্চারিত করাতে হবে । শিক্ষক/শিক্ষিকারা শিশুদের শিখন মান অনুযায়ী যেমন শিখন কাজ তৈরি করবেন তেমনি শিশুরাও এ কাজে যোগ দিয়ে তাদের চাহিদা অনুসারে শিখন ধারাকে পরিচালিত করতে পারবে।

১.৯.২. মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা শুরু করতে হবে। যারা গতি মেলাতে পারছে না বলে চিহ্নিত তাদের বেশি করে এ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে দিতে হবে। আদিবাসী, প্রত্যন্ত প্রান্তবাসী, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বালিকা, তফশিলি জাতি-জনজাতি বর্গের শিশুদের সঙ্গে কেন্দ্র স্তরের শিশুদের বৈষম্যের ভাব দূরীকরণে এই প্রযুক্তি যথেষ্ট উপযোগী হবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.৯.৩. ‘বাড়ির কাজ’ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি করে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায় কিনা দেখতে হবে। শিশুরা বিদ্যালয় শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে বা শেষ হওয়ার পরে ১/২ ঘন্টা Computer lab এ বাড়ির কাজগুলি শেষ করে বাড়ি ফিরতে পারবে। এই সুযোগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই করতে হবে।

১.৯.৪. অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যে ICT র ব্যবহারে আরও নতুনত্ব এসে গেছে। শ্রেণিকক্ষগুলি ধীরে ধীরে Computer –aided হয়ে পড়ছে। শিক্ষক এখানে নতুন নতুন পাঠ নির্মাণ করে শিশুর মান অনুসারে শিশুকে সমাধান করতে দিচ্ছেন। ফলে শিশুরা নিজেদের গতি অনুসারে সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে এগোতে পারবে। প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষে(virtual classroom) র লক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। অন্যদিকে CLRC থেকে প্রচারিত বিভিন্ন পাঠ বিশেষত ইংরাজি শোনা-বলার কাজও video conferencing এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিশুর কাছে পৌছে যেতে পারে (Continue classroom transaction)। এটি হলে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষকের অভাব সহজে পরিপূরণ করা যাবে। ইতিমধ্যেই বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ

বিশ্ববিদ্যালয় সারা রাজ্যে 'বিবেক-দিশা' নামে একটি প্রকল্পে ১৫ টি বিদ্যালয়কে নিয়ে এ ধরনের পঠন-পাঠন চালাচ্ছেন। সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটি Pilot Programme করে পরে ঐ ব্যবস্থাপনাকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

১.৯.৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণেও এই ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অনেক বেশি কার্যকর হবে বলে কমিটি মনে করেন। শিক্ষককে বারে বারে প্রশিক্ষণস্থলে ডেকে না এনে বিদ্যালয় বসেই কীভাবে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যায় তার ভাবনা মাথায় রেখে কমিটি এই সুপারিশটি করছে।

১.৯.৬. এখন থেকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'কম্পিউটার-সাক্ষরতা' (Computer Literacy) আবশ্যিক বলে ঘোষণা করতে হবে৷ আগামী দিনে প্রতি শ্রেণিকক্ষকে প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য এই সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.১০. শিখনমান ও তথাকথিত পিছিয়ে পড়া শিশুদের সমস্যা ও এ বিষয়ে সুপারিশ:

১.১০.১. শিশুর বয়স অনুযায়ী শিখনের একটা সুনির্দিষ্ট মান থাকা জরুরি৷ 'খেলার ছলে শিক্ষার' নামে অতি সহজ কাজ করতে দিয়ে শিখন মান খাটো করা যাবে না বা সংশোধনী পাঠের নামে একই কাজ পুনর্বার করতে দিয়ে স্মৃতি নির্ভরতা বাড়িয়ে বা কৃত্রিমভাবে করার অভ্যাস বাড়িয়ে কোন লাভ নেই ; বরং শিশুকে অর্থপূর্ণভাবে কাজে ব্যস্ত রাখার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হবে। যতক্ষণ না শিশুটি ঐ ন্যূনতম মানে পৌঁছাতে পারছে ততক্ষণ শিক্ষককে বিভিন্ন পাঠ ও কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে তাকে সেই মানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মানে ঘাটতি রেখে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা যাবে না। অথচ RTE যেহেতু কোনো শিশুকে অসমর্থ বলে ঘোষণা করার বিরোধী তাই তাকে মানে পৌঁছে দেওয়ার কাজটিকে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই যুক্ত করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শিখন সম্ভার, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি সহ সমস্ত প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। শিক্ষকতা পেশায় যিনি আসবেন তাঁকে জেনেই আসতে হবে যে এই পেশাগত কৌশল এবং তা কাজে লাগিয়ে তাঁকে সাফল্য লাভ করতেই হবে। মাধ্যমিক পাশ করলেই সবাই প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার যোগ্য এবং স্নাতক হলেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি পড়ানোর যোগ্য- এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাতে হবে। NCTE নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। শিক্ষকদের চাকুরির শর্তের মধ্যে বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে তার সাফল্যকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে হবে।

১.১০.২. শ্রেণিকক্ষ যেমন বহু শ্রেণিমানযুক্ত [multigraded] হতে পারে, তেমনি বহুস্তরীয় শিখন মান [multilevel] যুক্তও হতে পারে।তাই শ্রেণিকক্ষকে সবসময়ই বহুস্তরীয় শিখনমানযুক্ত শ্রেণিকক্ষ (multilevel classroom) ধরে নিয়ে শিখন পরিকল্পনা করাই দরকার। সেজন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি একটি **'সহযোগী শিখন সম্ভার'** থাকা একান্ত জরুরি এবং **পাঠগুলিকে থিম (Theme) অনুসারে সাজানো** ভাল।এই থিমগুলি বিভিন্ন স্তরের মান অনুসারে সেখানে সাজানো থাকবে।ফলে যে কোন শিশু পিছিয়ে পড়লে এই সহায়ক সম্ভারটির সাহায্য নিয়ে নিজের ঘাটতি পূরণ করে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে শিখন সম্পূর্ণ করতে পারবে। সেজন্য বর্তমান শিক্ষাক্রমে 'পিছিয়ে পড়া' বলে কোনো শিশুকে চিহ্নিত করার তেমন কোনো সুযোগ নেই। Multilevel classroom এর ধারণাটি সামনে রেখে সব শিশুর নিজস্ব গতিকে মর্যাদা দিয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কৌশল শিক্ষককে আয়ত্ত করতে হবে। অন্যদিকে, কোনো শিশু দ্রুতগতিতে শিখনে সক্ষম হলে তার জটিলতর সামর্থ্য অর্জনে কোনো বাধা থাকবে না, কেননা সহায়ক সম্ভারটি অনেক উন্নততর সামর্থ্যদানে সক্ষম হবে। এই সহায়ক সম্ভারটি একসঙ্গে একাধিক শ্রেণির জন্য কার্যকরী হতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি এই ধরণের শিখন সম্ভার নির্মাণের কাজ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিকস্তরের শ্রেণিগুলির জন্য একটি এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য আর একটি 'সহযোগী শিখন সম্ভার' পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে নিতে হবে। এগুলি শিশুকে তার নিজস্ব গতি (pace) বাড়িয়ে বা বজায় রেখে শ্রেণিকক্ষের সাধারণ গতিতেও সমন্বিত হতে সাহায্য করবে (pace-setting material)। এগুলি ব্যবহারে রীতি-কৌশল জানিয়ে দেওয়ার

জন্য একটি 'শিখন-পরামর্শ পুস্তিকা'(Teachers guide book) থাকবে। এছাড়া পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১.১০.৩. RTE Act, 2009 চালু হওয়ার ফলে শিশুর বয়স অনুযায়ী শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিদ্যালয়-ছুট শিক্ষার্থীকে এ মুহূর্তে হয়তো পঞ্চম শ্রেণিতে বা সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শিশুর শিখনমানে এই তারতম্যকে কমিয়ে এনে কীভাবে তাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য পরিকল্পনা শুধু রাজ্য বা জেলাস্তরে করলে চলবে না। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যেও তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কমিটি মনে করেন যে পুনরায় ভর্তি হওয়া বিদ্যালছুট শিশুটির বয়স এবং শিখন স্তরের মধ্যে ২ বা ৩ বছরের তারতম্য থাকলে নির্ধারিত ব্যবস্থাপনার মধ্যেই তার মনোন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সামর্থ্য মানে অবস্থান করলে তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় পঠন-ক্ষমতা বৃধির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেই শিক্ষার্থী নিজের মত করে এগিয়ে যেতে পারবে।

এক্ষেত্রে যেহেতু নতুন পাঠক্রমে বিষয়বস্তু অধিগত করার চেয়েও তার সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র পাঠ পরিকল্পনাটি বিশেষ কয়েকটি থিমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, তাই শ্রেণির বিভাজন ভেঙ্গে শিখন সামগ্রীগুলিকে এমনভাবে সংযোজিত করতে হবে যাতে সেখানে একক শ্রেণি (monograde) র বিচ্ছিন্ন কৃত্যালি না থাকে। বরং শ্রেণিটিকে বহুস্তরীয় গুণমানের (multilevel) শ্রেণিকক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে যে কোন শিশুর জন্য তার শিখনস্তর অনুসারে শিখনের কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি সহযোগী ও সুসংহত (integrated) শিখন সম্ভারের মধ্য দিয়ে শিশু নিজস্ব কৃত্যালি নির্বাচন করে আনন্দদায়ক ভাবেই ধীরে ধীরে নিজের গতিকে বাড়াতে পারবে এবং শ্রেণির স্বাভাবিক গতিতে ফিরে যেতে পারবে। যারা ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী তাদের গতি যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য শ্রেণিকক্ষে গ্রন্থাগার, বিকল্প পাঠসম্ভার এবং উন্নততর কৃত্যালির ব্যবস্থা শ্রেণিকক্ষে এবং তার বাইরে আয়োজন করতে হবে। এটি একটি সুসংহত (integrated) পাঠ পরিকল্পনার অঙ্গ। তাই এটির সঙ্গে মূল্যায়নকেও এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে শিশু তার নিজস্ব স্তরের কৃত্যালি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং তার জন্য পুরোপুরি মর্যাদা (credit) পেতে পারে। তাই যে কোনো থিমকে বিভিন্নস্তরে সামর্থ্য অর্জনের নিরিখে বিশ্লেষণ করে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখা গৌণ উদ্দেশ্য, বরং কীভাবে শিক্ষার্থীর ধারণার বিকাশ হয়েছে তাই মুখ্য এবং মান নির্ধারক। শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মানে পড়ে থাকা শিশুর জন্য 'বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করে তাদের উপযুক্ত পঠন-দক্ষতা বৃদ্ধিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক দ্বিতীয় ভাষায় CCE অনুষ্ঠানকালে চতুর্থ শ্রেণির শিশুদের পঠন ক্ষমতার মান যাচাই করা হচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্য হল দ্বিতীয় ভাষায় কোনো বস্তুর একবচন ও বহুবচনের ধারণা এসেছে কিনা দেখা। তারসঙ্গে শিশুর কাছে জানাতে চাওয়া হবে কেন সে ঐ সিদ্ধান্তে এলো। দ্বিতীয় ভাষায় তা লিখে জানাতে পারলে তার লিখন (writing) দক্ষতারও পরিমাপ করা যাবে একসাথে। এই অংশে একটি ছবি শিশুর কাছে দেওয়া হল। ওখানে তিনটি গাছের ছবি আলাদা আলাদা খোপে (Box) দেওয়া আছে। প্রথম গাছে পাঁচটি আম ধরে আছে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে পাঁচটির মধ্যে একটি আম পড়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ছবিতে দেখা য়াচ্ছে তিনটি আম পড়ে যাচ্ছে। সাথে একটি লাইন উল্লেখ করা আছে " Mangoes are falling." শিশুদের বলতে হবে কোন ছবিটি ঐ লাইনটির অর্থবাহক। সেই সঙ্গে শিশুকে বলতে হবে কেন সে ছবিটি নির্বাচন করল । ধরা যাক কোনো বিদ্যালয়ের সেরা একটি ছাত্র তৃতীয় ছবি টিকে '√' দিল এবং ব্যাখ্যা করে লিখল যে "In the third picture, it is seen that three mangoes are falling."। অন্য শিক্ষার্থী ও তৃতীয় ছবিতে '√' দিল এবং লিখল যে "Three mangoes are falling". অন্য দিকে আর একজন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ছবিটিতে '√' দিল এবং প্রথম ভাষায় লিখল 'আম পড়ছে'। তৃতীয় শিশুটির উত্তর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে শিশুটি অল্প হলেও পঠনে সক্ষম। তবে পর্যবেক্ষণে দুর্বল। দ্বিতীয় ভাষায় একবচন ও বহুবচনের আলাদা আলাদা আকারগুলি তার বোধগম্য নয়। তবে সে নিজের চিন্তার ধারাটি পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছে। ধরে

নিই যদি এই তিনধরণের শিশু একই শ্রেণিকক্ষে থাকে তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নে তাদের সামর্থ্য নিরূপণ কীভাবে হবে ? এক্ষেত্রে তৃতীয় শিশুটির গতি এবং শিখনস্তর স্বীকার করে নিয়েই মূল্যায়ন করতে হবে। যদি 'পড়তে পারছে কিনা' এই পর্বে তার নথি রক্ষা করতে হয়, তবে প্রথম শিশুটি 'খুব ভালো' যেমন পাবে তমনি তৃতীয় শিশুটি 'মোটামুটি ভাল' পাবে। অন্যদিকে লিখন সামর্থ্যে প্রথম শিশুটি যেখানে 'খুব ভাল', সেখানে তৃতীয় শিশুটি 'অতি সাধারণ' মান পাবে। কিন্তু এই মূল্যায়নটির পরই শিক্ষককে ঐ দিনই তৃতীয় শিশুটির জন্য বেশ কিছু শিখন সামগ্রী প্রয়োগ করতে হবে যার ফলে তার singular & plural এর বোধ আসে এবং ছবিতে সেটির প্রয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে, পঠনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরও ছোট ছোট কাজ দিতে হবে এবং সেইসঙ্গে মনের ভাব কীভাবে প্রকাশ করা যায় তার কৌশল ও তাকে চর্চা করাতে হবে। পিছিয়ে পড়া শিশুটিকে নিয়ে যখন এই কাজ চলবে তখন এগিয়ে যাওয়া ঐ শিশুদুটিকে সহযোগী শিখন সম্ভারে নিয়োজিত রাখতে হবে। তাদের অধিকতর চ্যালেঞ্জধর্মী পাঠ দিয়ে দলগতভাবে বা নিজে নিজে কাজ করার জন্য নিযুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনে ছবি আঁকা, বা অন্য কিছু মনোরঞ্জনকর কৃত্যালির সঙ্গেও তাদের যুক্ত রাখতে পারা যায় । শিশুর জন্য নির্দিষ্ট সামর্থ্য চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ/অভিজ্ঞতার বিন্যাস পাঠক্রমে থাকবে। এইভাবে পঠন-পাঠনের সঙ্গে শিশুর মূল্যায়নকে সুসংহত (integrated) করতে হবে। এ জন্য প্রাথমিকে সময়-সারণি হবে খুবই নমনীয় শ্রেণি-শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিশুর প্রয়োজনমত ঐ একজন শিক্ষকই সামর্থ্য বিকাশের স্বার্থে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে পারেন। উচ্চ প্রাথমিকেও এই সময়সারণিটিকে আরও নমনীয় করে মূল কয়েকটি বিষয়ে বেশি সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে জোড়া জোড়া পিরিয়ড ক্লাসও করা যেতে পারে।

একমাত্র যেক্ষেত্রে শিশুর মান প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে অথচ তাকে ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির মানে উন্নীত করতে হবে, তাদের জন্য বিদ্যালয়ের সময় সীমার বাইরে 'সেতু পাঠক্রমের' ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের শিখন সম্ভার এবং নিযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এটি সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে পরিচালিত হতে পারে। তবে পিছিয়ে পড়া সব শিশুকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে আলাদা পাঠকেন্দ্র খোলা (সাময়িক সময়ের জন্য হলেও) র সিদ্ধান্ত খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। নয়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিটিকেই তার জন্য সমর্থ হয়ে উঠতে হবে। এই শিখন সামগ্রী তৈরির জন্য একটি **State Text Book Board তৈরির প্রস্তাব** অন্যত্র করা আছে। না হলে সরকারি অর্থের অপচয় হবে কিন্তু কাজের কাজ হবে না। এযাবৎ পাঠ্যপুস্তক ছাড়া যত সহযোগী শিখনসম্ভার জোগান দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়স্তরে তার কতটুকু যে ব্যবহার হয়েছে তা নিয়ে কমিটির সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেও এ সন্দেহটি আরও দৃঢ় হয়েছে।

১.১১. কয়েকটি নতুন সুপারিশ

১.১১.১ স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা : বর্তমান পাঠক্রমে প্রাথমিকে শিশুর শরীরচর্চা ও সৃজনমূলক বা কর্মমূলক কৃত্যালিতে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় শিশুর সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে সময় সারণিতে আলাদা পিরিয়ড এর ব্যবস্থা করা, ঘন্টা মেপে শুরু হওয়া বা শেষ হওয়া- এই সব নির্দেশের শৃঙ্খলে এই সমস্ত চর্চা সঠিকভাবে হয় না। ফলে এগুলিতে গোড়া থেকেই রূপায়ণস্তরে দুর্বলতা থেকে গেছে। অন্যদিকে উচ্চ-প্রাথমিক বা মাধ্যমিকস্তরে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকলেও পাঠক্রমে বিষয়গুলির গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ফলে মাধ্যমিকস্তরে এই বিষয়গুলিকে বহির্পরীক্ষার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল; বিদ্যালয়স্তরে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী হিসাবেও আয়োজনের অভাব রয়েছে । ফলে এই সমস্ত বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত থাকলেও তার গুরুত্ব হ্রাস পেতে পেতে এমুহূর্তে নিতান্তই একটি অবহেলিত কৃত্যসূচি হিসাবে টিকে আছে। ফলত বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই এই সব বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্যান্য বিষয়ের পঠন-পাঠন নির্ভর কর্মসূচিতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক মর্যাদাহীনতার আবহে বিদ্যালয় স্তরে বিষয়গুলি থাকায় এদের কার্যকারিতা নিয়েও ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে।

কমিটি বিষয়টিকে অতি যত্নসহকারে বিবেচনা করে দেখেছেন এবং এবিষয়ে একমত যে দুটি পাঠ্য ও কৃত্যসূচিকেই পুনরায় শক্তিশালী করে সঠিক মর্যাদাদান প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসাবে তাঁরা ভেবেছেন যে যেহেতু প্রস্তাবিত পাঠক্রম এবং পাঠ্য ও কৃত্যসূচি অনেকাংশে শিশুর আনন্দ-আকর্ষণ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল এবং তা সর্বোপরি চাপমুক্ত ও স্বাধীন-গণতান্ত্রিক বাতাবরণের মধ্যে পরিচালিত এবং স্ব-শিখনের নীতিতে বিশ্বাসী, তাই শারীর শিক্ষা ও সৃজনশীল কৃত্যসূচির গুরুত্ব নতুন শিক্ষাক্রমে অনস্বীকার্য। তাই কমিটি মনে করেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শারীর শিক্ষা, শিল্পকলা চর্চা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক শিক্ষার কৃত্যসূচিকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রসারিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও কৃত্যসূচিও নির্মাণ করা দরকার। মূল্যবোধ ও শান্তির জন্য শিক্ষার ভিত্তিকে শিশুর মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করতে এই দুটি কৃত্যনির্ভর বিষয়ের চর্চা আরও গুরুত্ব সহকারে করা দরকার বলে এই কমিটি মনে করেন। শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি শ্রেণি পার্শ্ববর্তী এক একটি এলাকা অধিগ্রহণ (adopt) করে সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। শিশুরা জন-সমীক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক পরিকল্পনা, সাক্ষরতা এবং মাইক্রো প্ল্যানিং এর মত project গ্রহণ করতে পারবে। এটি শিশুর মধ্যে জনসেবা, পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ, এলাকা সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে। এছাড়া নন্দনশিল্পের চর্চা ও কর্ম-মুখী কৃত্যালিগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। চিত্রাঙ্কন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কৃত্যালি। এখানে শিশুর কল্পনা, ভালোলাগা, অবসর যাপনের বিস্তর পরিসর আছে। এই কৃত্যালিটিতে ভালবাসা থাকলে শিশুর কখনো নিজেকে একা বা বিচ্ছিন্ন মনে হবে না। তাছাড়া, যে সময়টুকুতে শিশু তেমন কিছু করে ওঠার সময় পাচ্ছে না সেসময়ে এই কৃত্যালিকে পাঠ্যসূচির অঙ্গীভূত করে ব্যবহার করলে শিশু বিপুল সাফল্য পেতে পারবে। প্রাথমিকে এই কর্মসূচিটি যে কোনো শিক্ষকই প্রশিক্ষণের পর শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় ব্যবহার করতে পারবেন। সেহেতু উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে এই পাঠ্যসূচিটিকে কিছুটা পঠন-পাঠন এবং কিছুটা হাতেনাতে করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা সহ এই সব কৃত্যালির জন্য যে একটি সমন্বিত বিষয় ভাবা হয়েছে তার মধ্যেই চিত্রাঙ্কনকে ১০ বা ১৫ শতাংশ গুরুত্ব (weightage) দিয়ে পাঠ্যসূচি নির্মাণ করা হচ্ছে। চিত্রাঙ্কন সহ সঙ্গীত, থিয়েটার বা নাটক, ফিল্ম স্টাডি, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলির একটিকে এই অংশে ঐচ্ছিক হিসাবে রাখা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কর্মশিক্ষার শিক্ষক নিজে পারলে ভাল, না হলে ঐ এলাকায় বসাবাসকারী উপরিউক্ত বিষয়ে কৃতী যুবক, মানুষকে বিদ্যালয়ে আহ্বান করে এই বিষয়গুলির চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে এই চর্চাগুলি শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। তবে মনে রাখতে হবে এখান কোনো পেশাদার মানুষকে বিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া এই কর্মসূচির লক্ষ্য নয়। তবে School Service Commission কে এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও Computer Learning এর মত বিষয়ও এই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হলে শিশুরা অনেকাংশে অগ্রগতি লাভ করতে পারবে।

১.১১.২. ত্রিভাষা সূত্র এবং তৃতীয় ভাষার প্রচলন : 'ত্রিভাষা' সূত্র এখন শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত নীতি। শ্রেণিকক্ষে ত্রিভাষার অবস্থান যে কোনো সমস্যা নয় বরং তা একটি সম্পদ- তা কমিটিও মনে করেছেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশু একসাথে পঠন পাঠনের কাজ সম্পন্ন করলে যে মিশ্র সংস্কৃতির বাতাবরণ গড়ে ওঠে তা ভারতবর্ষের মত এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোয় এক উপযোগী শিখন পরিবেশ। ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশু বহু ভাষাকে যে সহজেই আয়ত্ত করতে পারে তা গবেষণাপ্রসূত সত্য। এক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা শিখনের উপর জোর দেওয়ার নীতিটিকে কমিটি সুপারিশ করছেন। বর্তমানে তৃতীয় ভাষা শিখন একমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে রয়েছে। তার উপর পাঠক্রম, পাঠসূচি, পঠন-পাঠন প্রনালীর সংস্কার প্রয়োজন। তাই এটিকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে পরিবর্তিত করার সময় এসেছে। সর্বোপরি হিন্দি, নেপালি, সাঁওতালির মত প্রয়োজনীয় ভাষাগুলিকে এলাকাভেদে তৃতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে নতুনভাবে পঠন-পাঠন সম্পন্ন করলে শিশুদের এই ভাষাগুলিতে বাস্তবিক ব্যুৎপত্তি আসবে এবং তারা এই জ্ঞানটিকে পরবর্তী জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। অন্যদিকে কমিটি দেখেছেন যে সম্প্রতি ছাত্র/ছাত্রীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সংস্কৃত ও আরবিকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ঝোঁক দেখাচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থায় ঐ ছাত্র/ছাত্রীরা এ দুটি বিষয় একমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ার সুযোগ পেয়েছে । ফলে

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঐ বিষয়গুলির চর্চার মান বিঘ্নিত হয়। ফলে কমিটি মনে করে তৃতীয় ভাষার চর্চা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচ বছর হওয়া উচিত। এই চর্চাটি হতে হবে ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞান মেনে এবং শোনা, বলার কৌশল আয়ত্ত করার লক্ষ্যে। তৃতীয় ভাষাটিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত না করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজে বা অন্য কোনো বহিঃমূল্যায়ন দলের সাহায্য নিয়ে মূল্যায়ন করে আলাদা শংসাপত্র দিতে পারেন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল শংসাপত্রে তা উল্লেখ করতে পারেন। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়ও এটিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় ভাষাটিকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক হিসাবে পঠন-পাঠনের পক্ষে কমিটি মনে করেন যে নেপালি, সাঁওতালির মত সংবিধান স্বীকৃত ভাষা পাঁচ বছরে আবশ্যিক চর্চার ফলে সংশ্লিষ্ট ভাষায় অনেক শিক্ষার্থীর অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত ভাষায় উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যে এলাকায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত সে এলাকায় সাধারণ মানুষের ভাষাটি তৃতীয় ভাষা হিসাবে পঠিত হলেও ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি অন্য জনগোষ্ঠীর এক সহনশীলতা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠবে বলে কমিটি মনে করেন।

১.১১.৩. সমকালীন বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্তি : সমকালীন বিষয়সূচিকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করাও যে জরুরি তা কমিটি মনে করেন। এই কথা বিবেচনা করে কমিটি সুপারিশ করছেন যে রাষ্ট্রনীতির প্রাথমিক ধারণা, পঞ্চায়েতিরাজ, লিঙ্গবৈষম্যের কুফল, মিডিয়ার ভূমিকা, বাজার অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক রূপরেখা, সমতার নীতিতে বিভিন্ন আন্দোলন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন অংকন, সংগীত, শরীর চর্চা, খেলা-ধূলা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, রাজনীতি এবং দেশসেবায় অগ্রণী মানুষদের জীবন ও কর্ম-এর মতো বিষয়যুক্ত করা যেতে পারে। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ, টিভি, ইন্টারনেট বা রেডিও ব্যবহার করে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ এবং ছায়াছবি নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা সাম্প্রতিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে বির্তক এই ক্ষেত্রে যুক্ত করা যায়। এসব বিষয়ে শিশুর যাতে মুক্তমনে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং তাকে শিক্ষার অঙ্গনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে তা দেখতে হবে।

১.১২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে কমিটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে বারেবারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে গত দশ বছরে প্রাথমিকস্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণ হলেও শ্রেণিকক্ষে তার প্রতিফলন খুব কম। উচ্চ প্রাথমিকস্তরে গত ৪/৫ বছরে এই উদ্যোগ বৃদ্ধি পেলেও তার কোনো প্রভাবই শ্রেণিকক্ষে মেলে নি। চালু প্রশিক্ষণের হাল-হকিকৎ কেমন তা জানার জন্য ইতিমধ্যে কমিটি বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছেন। শিক্ষকতার পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য দু'ধরণের প্রশিক্ষণ চালু আছে।

ক) B.Ed, B.PEd এবং P.T.T.I পরিচালিত ১ বা ২ বছরের কোর্স, এগুলি মূলত প্রাক্-চাকুরি প্রশিক্ষণ, যদিও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক চাকুরি পাওয়ার পরে সরকারি অর্থ ব্যয় করে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

খ) সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) দৌলতে প্রতিবছর ২০ দিনের আবশ্যিক চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ। এছাড়া Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education এর আর্থিক আনুকূল্যে IASE, CTE সংস্থার পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ক) প্রথম ধরণের প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে সবাই যে সন্দিহান তা এই কমিটি স্বীকার করে নিয়েছেন। সর্বোপরি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কোর্সগুলি চলছে। একটি থেকে অন্যটি অনেকাংশে ভিন্ন। সব থেকে উদ্বেগের বিষয় যে, চালু কোর্স ও পাঠক্রমটি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি ও সমস্যা বুঝে নির্মিত হয় নি। ফলে তা বাস্তব থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যতে প্রশ্নাকারে বিষয় মুখস্থ করা এবং কোনো প্রকারে Certificate পাওয়া হয়ে পড়েছে। চাকরির শর্ত অনুযায়ী যা শিক্ষকতায় increment বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। আরও উদ্বেগের বিষয়ে যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের কোনো সমন্বয় না থাকার ফলে কার্যত মূল্যবান সময়

অর্থ অপচয় হচ্ছে। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নে এই জাতীয় প্রশক্ষণের কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। এই সব কথা বিবেচনা করে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন:

১.১২.১. আগামী একবছরের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Ed পাঠক্রমে অভিন্নতা আনতে হবে । এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয় পাঠক্রম অনুযায়ী B.Ed পাঠক্রমের সংস্কার করতে হবে। সেজন্য উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের একটি যৌথ সমন্বয় কমিটি তৈরি করে এ বিষয়টিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে P.T.T.I এর ২ বছরে পাঠক্রমকেও নয়া পাঠক্রমের আঙ্গিকে দ্রুত পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। তার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে আগামী ১ বছরের মধ্যে এটিরও পরিবর্তন দরকার। B.Ed College গুলির কার্যবলীর পরিদর্শন ও মানোন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষা সংসদে শিক্ষার প্রশিক্ষণ বিষয় আলাদা বিভাগের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় স্তরে NCTE এর পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের সংস্কার এখনই শুরু করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করেন।

১.১২.২. DIET গুলি এমুহূর্তে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি করা প্রয়োজন। DIET এর কর্মী নিয়োগ ও তার মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। জেলাস্তরে DIET টিকে মুখ্য সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করে তাকে দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। অন্য রাজ্যে DIET এর কার্যকারিতা দেখে এসে সেইমত এগুলিকে দ্রুত পুর্ননির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.১২.৩. সমস্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়ে (Training Institute) তত্বের চর্চার সঙ্গে বাস্তব শ্রেণিকক্ষে শিশুর সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সংযুক্ত করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ-শিক্ষার্থী ১/২ বছরের মধ্যে শিশু মনস্তত্ব, পঠন-পাঠনের উপযোগী পরিমণ্ডল এবং পাঠ বিশ্লেষণ ও পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োগ করে কোনটি সার্থক এবং কোনটি অসফল তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে বুঝতে পারেন।

১.১২.৪. দেশের অন্য রাজ্যের অনুরূপ এ রাজ্যে SCERT এবং DIET গুলিকে সমৃদ্ধ করতে হবে। SCERT, DIET এবং PTTI এর মধ্যে একটি কার্যকারী যৌথ আদান-প্রদান পরিবেশ যাতে গড়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। SCERT এর জেলাস্তরে কেন্দ্র হিসাবে DIET গুলিকে গণ্য করতে হবে।

১.১২.৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়কে ‘lab school’ গ্রহণ করে সারা বছর ধরে ধারাবাহিক গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ চালানো দরকার। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এইভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

১.১২.৬. জেলা ও চক্রস্তরে স্বল্পকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং সেগুলি সঠিকপথে পরিচালনার দায়িত্ব ও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে নিতে হবে।

১.১২.৭. শিক্ষাক্ষেত্রে ICT ব্যবহার এবং ব্যাপক Educational Technology কে প্রয়োগ করতে শিক্ষালয়গুলিকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে।

১.১২.৮. জেলাস্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজে ঐ জেলার সমস্ত স্বীকৃত প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে।

খ) সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীন যে ২০ দিনের প্রশিক্ষণ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতে পারে তাকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রশিক্ষণ হবে শিক্ষকদের চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু এ যাবৎ সর্বশিক্ষায় এবং অন্যান্য কেন্দ্রে যত প্রশিক্ষণ হয়েছে তা অনুষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্র সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহারের জন্য। ফলে শিক্ষকগণ এই প্রশিক্ষণগুলিকে নিতান্তই ‘অবশ্য হাজিরা’ হিসাবে গ্রহণ করেছেন মাত্র। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের যেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না তেমনি প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে তার জন্য কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। ফলে এগুলি ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি এই ব্যস্থাপনাটির মানোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন:

১.১২.৯. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যাতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্দিষ্ট করতে পারেন তার জন্য প্রস্তাবিত পাঠক্রম তাঁদের অবশ্যকরণীয় বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রতিটি চক্র সম্পদ কেন্দ্রকে (CLRC) প্রশিক্ষণের স্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে যোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে । CLRC গুলি স্থানীয় B.Ed, P.T.T.I college, DIET এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (academic) এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই প্রশিক্ষণগুলি পরিচালনা করবেন। স্থানীয় শিক্ষকদের চাহিদা মত প্রতিটি CLRC নিজেরা বসে যাতে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে পারে তার জন্য তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১.১২.১০. বিদ্যালয় ত্যাগ করে যাতে শিক্ষকদের বারে বারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে না আসতে হয়, তার জন্য ICT র মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে CLRC গুলির সংযোগ এইভাবে ঘটিয়ে দিতে পারলে ক্লাস চলাকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এমনকি শ্রেণিকক্ষগুলিকেও ঐ একই network এর অধীনে আনা যায়। দ্বিতীয় ভাষায় শোনা, বলার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থা খুব করুন। এক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং ধারাবাহিক করা যেতে পারে।

১.১২.১১. প্রশিক্ষণগুলিকে একটানা অনুষ্ঠিত না করে কয়েকটি phase এ ভাগ করে দিতে হবে। শিক্ষকগণ CLRC তে বসে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরিবর্তে কোনো না কোনো বিদ্যালয়ে শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে করতে এই প্রশিক্ষণগুলি গ্রহণ করবেন। মূলত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিশুগোষ্ঠী নিয়ে এই কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। নতুন পাঠ্যক্রমের শিক্ষকের পাঠপরিকল্পনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি কার্যকরী করতে বাস্তবসম্মত পাঠ পরিকল্পনা করাও এই প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যে বিষয়গুলি এবছর থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে:

- প্রস্তাবিত বিদ্যালয় পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা
- দ্বিতীয় ভাষার জন্য দেখা-শোনা-বলার কাজ
- সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের বার্ষিক রূপরেখা রচনা
- পার্বিক মূল্যায়নের স্থানীয় মাননির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট অভীক্ষা পত্র নির্মাণ
- পিছিয়ে পড়া শিশুকে শ্রেণিকক্ষের গতিতে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ ভাবনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ
- সমজাতীয় পাঠসম্ভার নির্মাণ, বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন পাঠ সামগ্রী রচনা এবং শিশুর প্রগতির সঙ্গে তাকে সম্বন্ধ যুক্ত করা
- ICT ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা।
- শিক্ষকদের তাৎক্ষণিক সাহায্য দান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের গ্রেডিং সম্পর্কিত আলোচনা
- শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারা ও ধারা সম্পর্কে আলোচনা ।
- ভাল বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এবং ভাল বিদ্যালয়ের পরিচালনার কৌশল। এটি প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পরিচালনা করা যেতে পারে।

১.১২.১১. প্রতিটি প্রশিক্ষণেই Educational Technology র ব্যবহার আবশ্যিক করতে হবে। শিক্ষকদের নিজেদের বিদ্যালয়ে বা CLRC তে প্রযুক্তির সাহায্যে সহযোগী পাঠ নির্মাণ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

১.১২.১২. প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের পরে প্রশিক্ষণের নীতি ও কৌশল শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছে কিনা এবং তাদের অসুবিধার প্রতিকারের জন্য তার জন্য শিক্ষা প্রশাসন ঢেলে সাজাতে হবে এবং একটি কার্যকরী

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কমিটির সুপারিশ হল, SCERT কে এই রাজ্যের Academic Authority হিসাবে ঘোষণা করা জরুরি। SCERT র মানব সম্পদ ও অন্যান্য শক্তি বৃদ্ধি করে জেলাস্তর পর্যন্ত তার কার্যকারিতা বর্ধিত করা প্রয়োজন। এ যাবৎ আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়টি খুবই অবহেলিত। শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর, নিজেদের মত করে খণ্ড খণ্ড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। রাজ্যস্তরে এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা (convergence) খুবই কম। ফলে এ বিষয়টি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়া উজিত। এ ক্ষেত্রে কমিটি মনে করেন যাঁরা পাঠ্যপুস্তক তৈরি করবেন, তারাই যদি প্রশিক্ষণের উদ্যোগে অংশ নেন তবে তা অনেক বেশি ফলপ্রশু হবে। একটি রাজ্যস্তরে দল এই কাজটি পরিচালনা করবেন যাতে এই কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থ শিশুদের কাজে লাগে। মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কৃত্যালি ও তার সহযোগিতাও এই দল করতে পারবেন, এদেরকে জেলা ও চকস্তর পর্যন্ত সমপ্রসারিত করতে হবে। এই বিষয়ে ‘রূপায়ণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা’র মধ্যে অনুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

১.১৩. বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ ও কার্যকরী কৃত্যসূচি নির্বাচন:-

RTE Act চালু হওয়ায় এটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে শ্রেণিকক্ষে ১ :৩৫ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বজায় থাকবে এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটি করে পর্যাপ্ত পরিসরের শ্রেণিকক্ষ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে একটি শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন কৃত্যালি কীভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য NCF 2005 এবং RTE 2009 (Chapter V, Section 29) অনুযায়ী এই সুপারিশগুলি করা হল :

১.১৩.১. প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ আগামী বছরের মধ্যে দলগত শিখনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য আসবাবপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রেণিকক্ষটিকে শিশুদের কাজের উপযুক্ত করতে হবে।
১.১৩.২. আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিকক্ষকেই দলগত পাঠ পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সে জন্য প্রতিটি শিক্ষক বর্ষব্যাপী পাঠ-পরিকল্পনা নির্মাণ করবেন। শিশুর ভিত্তিস্তরে শিখনের মান নিরূপণ করে তার পরবর্তী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবেন এবং পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক নিজেই তৈরি করবেন। শিখনস্তর অনুসারে শিশুদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নিয়ে শিক্ষক এই পরিকল্পনাটি নির্মাণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে তা জমা দেবেন। আগামী ১ বছরের মধ্যে সমস্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে এই পাঠ পরিকল্পনার প্রকৌশল শিখে নিতে হবে এবং প্রতিটি প্রধান শিক্ষককে এই প্রকৌশলের মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তৈরি করতে হবে।
১.১৩.৩ পাঠ পরিচালনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হবে অনেক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী, বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের যোগ্য গ্রন্থাগার, স্বল্প মূল্যের পরীক্ষা বা গবেষণার উপযোগী সামগ্রী, সহায়ক পাঠের সামগ্রী, বিকল্প ও অভিনব চিন্তার জন্য সূত্র সম্বলিত প্রয়োজনীয় পাঠ ও কৃত্যালি। সারা বছর ধরে এগুলি নির্মাণ করতে হবে মূলত শিক্ষককে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করণটি (CLRC) টিকে এ কাজের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযানের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে এই কাজটি শিক্ষক সুষ্ঠুভাবে করবেন।
১.১৩.৪ সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন চলাকালীনই করতে হবে। এর জন্য আলাদা কোনো তারিখ নির্ধারণ করা যাবে না। মূল্যায়নের জন্য আগে থেকে কোনো ঘোষণাও করা যাবে না। শিশুটির কাজের ও সাফল্যের খতিয়ান শিক্ষক রাখবেন তার একটি দিনলিপিতে। প্রতিটি শিক্ষক শ্রেণিপিছু একটি করে দিনলিপি রাখবেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব হবে এটি দেখা এবং এই প্রক্রিয়াটিকে ক্রমাগত উন্নত করে এই নথির ভিত্তিতে শিক্ষকের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
১.১৩.৫ নয়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিটি হবে যথেষ্ট নমনীয় এবং শিশুকেন্দ্রিক; ফলে সমগ্র ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর জন্য যথেষ্ট সময় পরিসর (Time space) রাখতে হবে যাতে সে বিষয়টিকে বুঝতে, উপলব্ধি করতে নিজের পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে, এবং অভিনব পদ্ধতিতে সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করতে পারে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘন্টা বাজিয়ে পিরিয়ড বিভাজন পদ্ধতিকে অনেক নমনীয় করে তুলতে হবে। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়েও জোড়া জোড়া ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে। শ্রেণিকক্ষের সময়-সারণি তৈরিতে শিক্ষকদের স্বাধীনতা দিতে হবে। RTE তে নির্দেশিত প্রাত্যাহিক কাজের সময়টিকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে শিশুরা ঐ সময়ের মধ্যেই অভীষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছতে পারে। সমীক্ষা, project তৈরি, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, বীক্ষণগারে কাজ, বিভিন্ন সৃজনমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজ এবং পর্যাপ্ত খেলাধুলায় তাদের অর্থপূর্ণ ভাবে নিয়োজিত রাখতে হবে। বাহ্যত যারা পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে তাদের জন্য গতি মেলানোর কাজটিকেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষকদের। উপরন্তু শিক্ষকদের নিজের প্রস্তুতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য যথেষ্ট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এই নির্ঘন্টটি কতটা শিশু-বান্ধব ও শিখন-পরিবেশের অনুকূল হয়েছে তা পর্যালোচনা করবেন এবং তার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য কৃত্যালি পরিবর্তনের সুপারিশ করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজনে একজন শিক্ষকই সারা বছর ধরে একটি শ্রেণির দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারেন। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে চালু করা আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করেন।

১.১৩.৬ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে স্বাধীনভাবে কৃত্যালি পরিচালনার অধিকার (autonomy) দিতে হবে। তাই নতুন পাঠক্রমে অনেকাংশ শিক্ষককে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজস্ব পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, কৃত্যসূচি এবং পাঠ্যসামগ্রী তৈরির অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে। যেমন প্রাথমিকস্তরে ‘প্রকৃতি ও পরিবেশ’ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা এবং এলাকার প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণের অধিকার শিক্ষকের থাকবে। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক এই বিষয়ের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠসামগ্রী তৈরি করবেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন কেমন করে শিক্ষক এই কাজে তাঁর মেধা প্রয়োগ করছেন এবং শিশুদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের গুণগতমান কতখানি বেড়েছে। এর ভিত্তিতে ও তাদের ‘ভাল শিক্ষক’ খোঁজার কাজ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করবেন এবং প্রতি বছর ‘শিক্ষক দিবসে’ এই সমস্ত শিক্ষকদের সম্মানিত করার ব্যবস্থা করবেন।

১.১৩.৭. পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তক একমাত্র উপকরণ নয়। এটিকে একটি শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী হিসাবে দেখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিখন সামগ্রী বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শেষ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এই দুটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিখন সম্ভারটি নিয়ে গৃহে যেতে পারবে না। তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম পর্যন্ত শিশুরা তাদের পাঠ্যপুস্তক গৃহে নিয়ে যেতে পারবে ঠিকই; তবে শিক্ষক ইতিমধ্যে পাঠ্যবই এর অনুসারী সমজাতীয় ‘বাড়ির কাজ’ শিশুদের জন্য তৈরি করে রাখবেন। সেগুলি শিক্ষার্থীরা কারো সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজে করে দেখবে এবং পরের দিন শিক্ষকদের দেখাবে। বাড়ির কাজ করে আনলেই শিশুকে পূর্ণমর্যাদা দিতে হবে। সেগুলি ঠিক না ভুল তা তিনি কাজগুলির দেখার সময় শিশুকে বুঝিয়ে দেবেন। শাস্তি না দিয়ে তাকে আরো ভালভাবে নিজে নিজে বাড়ির কাজ করে আনতে বলতে হবে, দেখতে হবে বাড়ির কাজের ভয়ে যেন শিশুর বিদ্যালয়ে আসা অনিয়মিত হয়ে না পড়ে।

১.১৩.৮. তৃতীয় শ্রেণির পর থেকে শিশুর ‘লেখার সামর্থ্য’ (Writing skill) এর উপর জোর দিতে হবে। তার জন্য হাল্কা থেকে কঠিন স্তরে ‘মানস-মানচিত্র’ (mind mapping) সহ বিভিন্ন কৃত্যালির চর্চা করা প্রয়োজন। শিশু নিজে ভেবে যাতে কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারে তার উপর জোর ও উৎসাহ দিতে হবে।

১.১৩.৯. পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের চেয়েও স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সৃজনমূলক ও উৎপাদনাত্মক কাজের উপর বেশি জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে বেশ কয়েকটি মূল্যবোধ নির্মাণ ও সুস্থ শরীর সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বাস্থ্যচর্চার পরিসর বাড়াতে এই কৃত্যসূচি পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীর উপর মূল্যবোধের নীরস .উপদেশাবলি চাপিয়ে না দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকা, গান, গল্প, বলাবলি, বির্তক, সমবেত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই মূল্যবোধের চর্চা শিশুকে সারা বছর ধরে করাতে হবে। এর জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় ধার্য করতে হবে। তবে প্রাথমিকে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের সঙ্গে যতটা তাকে সংযুক্ত করা যায় ততটাই ভাল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় কৃত্যালির মধ্যেই সমন্বিত হয়ে থাকবে। তাই সময় সারণি তৈরির সময় সে দিকে নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয় এর গ্রেডিং করার সময় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এই বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে নজর দেবেন। প্রতি বছর ‘ভাল বিদ্যালয়’ নির্বাচন করে পুরস্কৃত করার পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১.১৩.১০. শ্রেণিকক্ষের নিজস্ব গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের গতিপথে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিদিনই শিক্ষককে নিজস্ব পরিকল্পনা রাখতে হবে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। এই কাজটি কোন শিক্ষক কেমনভাবে করছেন তা নজর রাখবেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং তার ভিত্তিতে ‘শিক্ষক সম্মান’ প্রদান করবেন।

১.১৩.১১. গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের একটি কার্যকরী অঙ্গ। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি সম্পন্ন ও কার্যকরী গ্রন্থাগার নির্মাণ করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এ সংযোজিত তফশীল এ বিদ্যালয়ের যে মানের উল্লেখ আছে তার ৬ নং অংশে গ্রন্থাগারের মান নিয়ে নির্দেশ আছে : "প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার থাকবে, যেখানে নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত হবে বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা।" সব বিষয়ের বই (গল্পের বই সমেত) থাকবে। এটি আব্যশিক একটি বিষয়। সরকারকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার নির্মাণ করতেই হবে। এছাড়া NCF-2005 এ গ্রন্থাগার এর প্রয়োজনীতা নিয়ে বিশেষ সুপারিশ করা আছে। আমাদের রাজ্য গ্রন্থাগার নির্মাণের উদ্যোগটি অনেকদিন আগে থেকে চালু আছে। প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা এবং গ্রন্থাগারিক নিয়োগ এই রাজ্যে চালু আছে। যদিও একথা সত্য যে প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থবরাদ্দ খুবই সীমিত। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫০ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক রয়েছেন যদিও অনেক বেশি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে। পশ্চিমবঙ্গের এই সংস্কৃতিটি নষ্ট না করে বর্তমান সরকারকে সমস্ত বিদ্যালয়ে(উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে লোক নেওয়ার ব্যবস্থা করলে শিখনমান উন্নত হবে বলে কমিটি করেন। তবে বিপরীতে একটি হতাশাজনক চিত্রও কমিটির কাছে এসেছে। দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত আছেন সেখানেও গ্রন্থাগারের কাজ সাধারণত গ্রন্থাগারিক করেন না, বরং তাঁকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠনের কাজে নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যালস্তরে গ্রন্থাগারের বিস্তৃত কাজের ধারাকে উপলব্ধি করতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক নিজেও সক্ষম বলে কমিটি মনে করেছেন। গ্রন্থাগারিক নিজেকে 'শিক্ষক' প্রতিপন্ন করার জন্য যতটা আগ্রহী; তাঁর নিজের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ততটা নন। ফলে ব্যবস্থাপনাটি অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে গেছে। শুধু গ্রন্থাগারিক পদ অনুমোদন করলেই হবে না; বরং গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে হবে সমগ্র শিখন প্রক্রিয়ায়। তাই :

ক) গ্রন্থাগারিক পঠন-পাঠনের বাইরে অতিরিক্ত সময় গ্রন্থাগার খুলে রেখে শ্রেণিভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করবেন । বই-পড়ার সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন সারা বছরের জন্য।

খ) ঐ সময়ে বই-দেওয়া নেওয়াও করবেন। শিশুর শিখনমান সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অবহিত হবেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছ থেকে। মূল্যায়নগুলির ফলাফলগুলি নজরে রেখে শিশুর উপযাগী পুস্তক-পুস্তিকা তিনি নির্বাচন করে রাখবেন।

গ) গ্রন্থাগারিক বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক সভার আয়োজন করবেন । স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষকে আহ্বান করে শিশুদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন।

ঘ) প্রতিটি শিশু গ্রন্থাগারের জন্য একট practical book ব্যবহার করবে। এটিতে সারা বছরে কী কী বই সে পড়েছে, তাতে কি জানা গেছে, বিশেষ বিশেষ তথ্য এবং আকর্ষণীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। প্রিয় লেখকদের ছবি এবং তাদের জীবনীও সেখান লিখতে পারবে।

ঙ) গ্রন্থাগারটিকে প্রযুক্তি নির্ভর করে বেশ কিছু বই এর নির্যাসটুকুকে তার মধ্যে বিধৃত করে রাখতে পারবেন গ্রন্থাগারিক। কোনো নতুন বই উপযোগী মনে হলেই কোনো শ্রেণিকে ডেকে তার demonostration এর ব্যবস্থা করবেন।

চ) প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা বাছাই করে এক একটি শ্রেণির জন্য মজুত রাখবেন। প্রয়োজনে হ্যান্ড-ট্রলির মাধ্যমে শ্রেণিপঠনের সময় ঐ পুস্তকগুলি সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে পাঠিয়ে দেবেন। বিষয় শিক্ষকদের সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ নির্মাণও গ্রন্থাগারিকের কাজের মধ্যে পড়ে। যে বিদ্যালয়ে সম্ভব সেখানে শ্রেণিভিত্তিক মিনি গ্রন্থাগারও তৈরি করতে পারেন। সেই পরিচালানার জন্য শিশুদের দল নির্মাণ করতে পারেন।

ছ) প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি নজর রাখতে হবে যেন তাঁকে সাধারণ পঠন-পাঠনের কাজে অহেতুক ব্যবহার না করা হয়। বরং শ্রেণি পঠনের সময় তিনি বিভিন্ন শ্রেণিতে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং শিশুদের কাজ দেখে উপলব্ধি করতে পারেন কোন শিশুর কী ধরনের শিখন সম্ভার প্রয়োজন। তার উপর ভিত্তি করে তিনি পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারেন।

জ) এটি সফল করতে গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের চাকুরীসংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলিকেও সরকারের বিবেচনা করা উচিত বলে কমিটি মনে করেন।

ঝ) যে বিদ্যালয়ে কোনো গ্রন্থাগারিক নেই সেখানেও এই কৃত্যালিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে থেকে কয়েকজন শিক্ষককে নির্বাচন করে এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে এবং উপরিউক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন প্রধান শিক্ষক এই কাজটি কীভাবে পরিচালনা করছেন তার উপর এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করছে । বিদ্যালয়ে গ্রেডিং এ এই কাজটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

ঞ) ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগারের আব্যশিকতা নিয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ট) প্রাথমিকবিদ্যালয়ে শ্রেণি শিক্ষক উপরের কাজগুলি দেখভাল করবে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিশুর উপযোগী অনেক পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ করতে হবে। সরকারও এই ভণ্ডার বাড়ানোর জন্য নিয়মিত অনুদান দেবেন।

১.১৩.১২ সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিচালনার জন্য RTE নির্দেশিত বরাদ্দ সময় সংক্রান্ত সুপারিশ নিচের সারণিতে দেওয়া হল :

শ্রেণি	**শিক্ষার্থীর কাজের সময়**	**শিক্ষকের প্রস্তুতি ও অন্যান্য কাজের জন্য বরাদ্দ সময়**
প্রথম ও দ্বিতীয়	দৈনিক ৪ ঘন্টা (মিড ডে মিলের সময় বাদে) ২০০ কাজের দিন অর্থাৎ ২০০ X ৪ = ৮০০ ঘন্টা	সপ্তাহে ২০ ঘন্টা শ্রেণী পিছু সর্বোচ্চ ৪০ জন শিশুর জন্য পাঠ-পরিকল্পনা, শিখন সামগ্রী নির্মাণ, CCE র অভীক্ষাপত্র নির্মাণ, Report card রক্ষা এবং CLRC তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, অভিভাবকদের সঙ্গে সভা, শিশুদের জন্য খেলাধূলা ও সৃজনমূলক কাজে সময় দান, পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা। স্থানীয় ভৌগোলিক , সামাজিক পরিবেশ ও প্রাচীন নির্দশন নিয়ে পাঠক্রম পাঠ্যসূচি নির্মাণ, বাড়ির কাজ দেখা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ ইত্যাদি।
তৃতীয় থেকে পঞ্চম	দৈনিক ৫ ঘন্টা (মিড ডে মিলের সময় বাদে) ২০০ কাজের দিন অর্থাৎ ২০০ X ৫ = ১০০০ ঘন্টা (২০ দিন পার্বিক মূল্যায়ন বাদে)	সপ্তাহে ১৫ ঘন্টা (শ্রেণি পিছু সর্বোচ্চ ৪০ জন শিশুর জন্য)এবং উপরিউক্ত কাজ
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম	দৈনিক ৫১/২ ঘন্টা (মিড ডে মিলের সময় বাদে) ২০০ কাজের দিন অর্থাৎ ২০০ X ৫১/২ = ১১০০ ঘন্টা (২০ দিন পার্বিক মূল্যায়ন বাদে)	সপ্তাহে ১২ ঘন্টা এবং উপরিউক্ত কাজ (শ্রেণি পিছু বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ ৩৫ জন শিশুর জন্য)
নবম-দশম	দৈনিক ৬ ঘন্টা (মিড ডে মিলের সময় বাদে) ২০০ কাজের দিন অর্থাৎ ২০০ X ৬ = ১২০০ ঘন্টা (২০ দিন পার্বিক মূল্যায়ন বাদে)	সপ্তাহে ৮ ঘন্টা এবং উপরিউক্ত কাজ (শ্রেণি পিছু বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ ৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য জন্য)

১.১৩.১২. বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তথ্যটিকে মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারার চেয়ে জোর দিতে হবে তথ্য আহরণ ও জ্ঞান নির্মাণের পদ্ধতির উপর। কোনো শিশু এই কাজটি করতে পারলেই তার জন্য মর্যাদাপূর্ণ মান ধার্য করতে হবে।

১.১৩.১৩. পঠনপাঠনের সময় কিছু করণীয় বিষয় মনে রাখতে হবে।

- শিক্ষকের সক্রিয়তা যাতে শিশুকে নিষ্ক্রিয় না করে দেয় তা দেখতে হবে।
- শিক্ষক সমাধানের লক্ষ্যে শিশুদের পরিচালিত করবেন। ছোট ছোট সমাধান থেকে বড় সমাধানের আবিষ্কারের স্বাদ যেন দলগতভাবে বা একাকী শিশু পেতে পারে তা ব্যবস্থা করবেন।
- বিষয়বস্তুর কোনটি নিয়ে কাজ করবেন তা বলে না দিয়ে ছোটো ছোটো নানা কৃত্যালির মধ্যে দিয়ে শিশুকে অজ্ঞাত বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা ও উপলব্ধি তৈরি করাতে চেষ্টা করবেন। এই ভাবে ক্রমশ জটিল হয়ে পড়া সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেলেই পাঠ্যবই এর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাবেন এবং কাজগুলি নিজেদের করতে বলবেন। তারা প্রথমে দলগতভাবে এবং পরে নিজে কাজটি করতে পারবে। সমজাতীয় কাজ 'বাড়ির কাজ' হিসাবে করতে দেবেন।

১.১৩.১৪. উপরে উল্লিখিত শ্রেণি পরিচালনার প্রকৌশলগুলি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে হলে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য প্রস্তুতির সময় দিতে হবে। বিদ্যালয়ের নির্ঘন্টের মধ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রস্তুতির জন্য সময় বরাদ্দ করতে হবে।

১১.১৩.১৫. NCF -2005 বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বীক্ষণাগার (laboratory) গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করেছেন। আমাদের রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যেখানে বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে সেখানে এই বীক্ষণাগারের সুবিধা রয়েছে। বীক্ষণাগার উন্নয়নের জন্য বার্ষিক অনুদানও কখনো কখনো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উচ্চপ্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালগুলিতে এই বীক্ষণাগারের সুযোগ নেই। অন্যদিকে এ রাজ্যের চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। এমনকি যে বিদ্যালয়গুলিতে বীক্ষণাগার আছে সেখানেও দুজন করে বীক্ষণাগার কর্মী আছেন। কিন্তু শোনা যায় ঐ কর্মীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে কাজ করেন, বীক্ষণাগারের কাজ তাঁদের কাছে গৌণ। এমনকি, সব সুবিধা থাকলেও বীক্ষণাগার ঠিকমতো ব্যবহার হয় না। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা সবাই এই বীক্ষণাগারের আসে না; এমনকি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রাইভেট টিউশনির মত বেসরকারি labও তৈরি হয়ে গেছে শহরাঞ্চলে। সেখানে নাকি অনেক যন্ত্র নিয়ে শিশুকে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি করানো হয়। অন্যদিকে উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিটিকে এই ধরনের পরীক্ষার সুযোগ কম, যে ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে lab এর প্রয়োজন নেই বলে অনেক শিক্ষক মনে করেন। কিন্তু এই পাঠক্রমে বিজ্ঞান বিষয়টি স্মৃতিনির্ভর হয়ে গেছে।

নয়া পাঠক্রমে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এমন অনেক বিষয়বস্তু বিজ্ঞানে সংযুক্ত হয়েছে যেখানে বীক্ষণাগারের ব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় । তাই প্রতিটি বিদ্যালয়েই একটি একত্রীভূত (composite) বীক্ষণাগার করা প্রয়োজন। সরকার এ বিষয়ে নিশ্চয়ই উদ্যোগ নেবেন। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষকেই এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যে সেখানে পর্যাপ্তভাবে **বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের কর্নার (corner)** তৈরি করা যায়। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক লক্ষ্য রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ কীভাবে এর সদ্‌ব্যবহার করছেন এবং শ্রেণিকক্ষের ভেতর ও বাইরে তা ব্যবহার করছেন।

১.১৩.১৬. উচ্চপ্রাথমিকে (ষষ্ট, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে) একজন শিক্ষকই সুসংহত (integrated) বিজ্ঞানটি এক এক এক শ্রেণিতে পরিবেশণ করবেন। যেহেতু একটি পাঠ্যসূচির মধ্যেই জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যাকে সুসংহত করা হয়েছে তাই একজন শিক্ষকই তা করবেন। প্রয়োজনে তিনি অন্যান্য শিক্ষকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন সবার জন্য বাস্তবসম্মত পাঠ-পরিকল্পনা করার জন্য বা বিষয়টির সবক্রমে আরও গভীরে প্রবেশের জন্য। শুধু এক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণিতে কিছুটা নমনীয়তা রাখা যেতে পারে কোনো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্গে যৌথ পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে এবং শিক্ষনক্রম যাতে ব্যহত না হয় তা দেখতে হবে।

১.১৪. পাঠ্যসূচি/কৃত্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

যে কোনো পাঠক্রমকে সফলভাবে রূপারিত করার জন্য চাই উপযুক্ত পাঠ্যসূচি, প্রয়োজনীয় কৃত্যালি এবং সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তক। কমিটি বর্তমানে প্রাথমিকে চালু পাঠ্যসূচি ও কৃত্যালি পর্যালোচনা করেছেন; সেই সঙ্গে NCERT ও ICSE র পাঠ্যসূচিরও অনুপুঙ্খ বিচার করেছেন। অন্যদিকে উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যবইগুলি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিস্তর আলোচনার পর পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক রদবদলের ভাবনা আনা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক এই ভাবনাগুলি পরে আলোচিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে পাঠ্যসূচিতে যে পরিবর্তন সুপারিশ করা হয়েছে তা হল:

১.১৪.১. বিষয়বস্তুর তথ্যভিত্তিক চর্চার আধিক্য কমিয়ে পাঠ্যসূচিকে শিশুদের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা।

১.১৪.২. স্মৃতি-নির্ভরতাকে কমিয়ে বোধ ও প্রয়োগের সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং অনুরূপ উপ-এককের অবতারণা করা।

১.১৪.৩. জ্ঞান আহরণের কৌশল আয়ত্ত করার জন্য শিশুকে বিভিন্ন সহযোগী পাঠ-সম্ভার, শিক্ষামূলক প্রযুক্তি এবং গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারের সাহায্য নিতে শেখানো।

১.১৪.৪ প্রতিটি একক চর্চার সময়ে বাস্তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট উদাহরণ ও সমস্যাকে পাঠের মধ্যে সংযুক্ত করা এবং তার থেকে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে সাহায্য করা।

১.১৪.৫ পাঠ্যসূচির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের (integration) সুযোগ রাখা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এই সমন্বয়ের এর পরিমণ্ডল একশো ভাগ রাখা প্রয়োজন। সমগ্র পাঠ্য ও কৃত্যসূচিকে 'বিষয়' এর সীমায় খণ্ডীকৃত না করে সবটুকুকেই তার জ্ঞান নির্মাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শুধুমাত্র একটি 'শিখন-সম্ভার' তৈরির সুপারিশ করেছে কমিটি। এই শিখন সম্ভারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'সহজপাঠ' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ)। সহজপাঠের প্রতিটি অধ্যায়ের পাশাপাশি একদিকে যেমন ভাষা শিখনের উপযোগী বিভিন্ন উপএকক সংযোজন করতে হবে তেমনি তার সঙ্গে শিশুর পরিবেশ বোধ, দ্বিতীয় ভাষা শিখনের উপযোগী শব্দসম্ভার সহ সংশ্লিষ্ট সামর্থ্য এবং গণিতের সংখ্যা পরিচিতি গাণিতিক ধারণা নির্মাণের কার্যাবলী একত্রে শিশুর শিখনকে সার্বিক (holistic) করে তুলবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের চারটি পাঠ্য-পুস্তক থাকবে- প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি। শিশুর হাতেনাতে কাজ, বিভিন্ন সমীক্ষা, project work, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক ও সৃজনমূলক উৎপাদনাত্মক কাজ এর বিবিধ কাজ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শিল্পকলা চর্চা, সৃজনমূলক ও উৎপাদনাত্মক কাজগুলিকে বিচ্ছিন্ন কোনো সহপাঠক্রমিক বিষয় হিসাবে না দেখে সেগুলিকে পাঠক্রমিক কর্মসূচিতে বিবর্তিত করতে হবে। এমনকি প্রথমভাষা ও পরিবেশ পরিচিতির সঙ্গে ক্রীড়া ও শরীরচর্চার কৃত্যালিকে সুসম্বন্ধ করতে হবে। তার কারণ হল শিশুর প্রগতি শুধুমাত্র পাঠ-নির্ভর জ্ঞানচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং তার বিভিন্ন সামর্থ্যের বিকাশ সংঘটিত করতে হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই। এই কারণেই সৃজনমূলক, উৎপাদনমূলক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কৃত্যালি ও শরীর ও স্বাস্থ্য চর্চাকে পাঠক্রমিক বিষয় হিসাবে দেখতে হবে। শিশু এগুলিকে কেন্দ্র করে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা ও রুচি পছন্দের বিষয়গুলিকে লিখিতভাবেও পেশ করতে পারবে । কমিটির সুপারিশ শিখন সম্ভারগুলি এই নিরিখেই নির্মাণ করতে হবে।

১.১৪.৬. প্রচলিত পাঠক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২২ টি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। কমিটি মনে করেন যে সমন্বয় বর্জিত এই পুস্তকগুলি শুধুমাত্র তথ্যের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হয় এগুলি শিশুর মধ্যে অহেতুক স্মৃতি-নির্ভরতা বাড়াচ্ছে তাই তা থেকে শিশুকে মুক্ত করতে হবে। এই কমিটি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র ১৪ টি পাঠ্যপুস্তক সুপারিশ করেছেন।

অবশ্য ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে আরো বিভিন্ন বিষয়ে শিশুকে উৎসাহী করতে হবে। তবে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ইতিমধ্যে শিশু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার প্রাথমিক সামর্থ্য ভালভাবে আয়ত্ত করেছে । এই শ্রেণিগুলিতে যে যে বিষয়ের পাঠ্যসূচি থাকতে পারে তা হল- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা, গণিত, 'পরিবেশ পরিচিতি- বিজ্ঞান', 'পরিবেশ পরিচিতি- ভূগোল' এবং পরিবেশ পরিচিতি- ইতিহাস। এছাড়া আবশ্যিক পাঠ্য ও কৃত্যসূচির অধীনে থাকবে একটি বিষয়। সেটি হল কর্ম ও সৃজনমূলক শিক্ষা, শিল্পকলা চর্চা এবং স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা। এই পাঠ্য ও কৃত্যসূচিগুলি সংযোজিত হবে শিশুর বাস্তব পরিবেশ ও সমাজ থেকে আহৃত বিষয়বস্তু নিয়ে। এটি সমন্বিত একটি বিষয় হিসাবে পঠন-পাঠনের অঙ্গ হবে। সহ-পাঠক্রমিক না করে মূল্যায়নের সঙ্গে সার্বিকভাবে যুক্ত করতে হবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এখানে শিশুরা সহজ থেকে জটিলতর সমস্যার বিশ্লেষণে যেতে পারবে এবং তার সমাধানের সম্ভাব্য কৌশল নিজেই আয়ত্ত করতে পারবে। শিশুর জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখতে হবে যাতে সে এই পাঠ ও কৃত্যসূচিগুলি নিজের গতিতে করে উঠতে পারে এবং আত্মীকরণ করতে পারে। গণিতের ক্ষেত্রেও ছোটো ছোটো সংখ্যা নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগকে কেন্দ্র করে তার অন্য আরও ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বাস্তব সমস্যা হিসাবে শিশুর কাছে তুলে ধরতে হবে। ঐ বাস্তব সমস্যা সমাধানে শিশুরা বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া (operation) গুলির প্রয়োজনীয়তার বুঝতে পারবে এবং সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন সূত্র ও নিয়ম নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করে সমস্যা নিরসন করবে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তাই সমস্ত শিখন সম্ভারকেই ঐ আঙ্গিকে তৈরি করতে হবে। শুধু অনুশীলনী পত্র দিয়ে পুস্তককে ভরিয়ে দেওয়া অনুচিত হবে।

নবম ও দশম শ্রেণিতে শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচি দ্বিখন্ডিত হবে- প্রকৃতি বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানকে আলাদাভাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি উচ্চপ্রাথমিকের সঙ্গে সুসংবদ্ধ হবে। যেহেতু মূল্যায়ন ব্যবস্থা দশমশ্রেণির শেষভাগ পর্যন্ত একইভাবে চলবে তাই পঠন-পাঠন কৌশলও একইরকম হবে। শুধু শিখন সম্ভারের বিষয়বস্তুগুলিকে যাতে বিদ্যালয়ের বীক্ষণাগার, গ্রন্থাগার, Computer এবং বিদ্যালয়ের বাইরে অনুষ্ঠিত কৃত্যালির সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলি শিশুকে অধিকতর জটিল ভাষাগত সামাজিক ও গাণিতিক সমস্যা নিরসনে সাহায্য করবে।

১.১৪.৭. পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের পূর্বে নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার তৈরি করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেন একটি সহযোগ ও আদান-প্রদান থাকে। নতুন শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার অর্থ ও প্রয়োগকে আরও স্বচ্ছ করে তুলতে হবে।

১.১৪.৮. পাঠ্যপুস্তকের এককগুলিকে যতটা সম্ভব অপ্রথাগত শিরোনামে ভূষিত করতে হবে। সেগুলি হবে আকর্ষণীয়। শুরু থেকে সহজ সরল শব্দ প্রয়োগ উচিত হবে। উপরন্তু শিশুর বাস্তবজীবন থেকে নেওয়া ঘটনা বা সমস্যা দিয়ে গল্পের ছলে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এক একটি পাঠ-একক বটবৃক্ষের মতো বহুধা বিস্তৃত জীবন্ত ও সার্বিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হবে। ক্যাপ্সুল এর মতো করে নিয়মতান্ত্রিক উদাহরণ দিয়ে বিচ্ছিন্ন তথ্যের সম্ভারে ভারাক্রান্ত করা যাবে না।

১.১৪.৯. পুস্তক রচনা/বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি দলে একজন চিত্রশিল্পী, একজন শিশুসাহিত্যিক থাকবেন আশা করা যায়। অন্তত একজন শিশু মনস্তত্ত্ববিদ এবং একজন সমাজ বিশেষজ্ঞকে সমগ্র দলের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে যাতে তাঁরা প্রয়োজন মতো পাঠ্যপুস্তকের অংশবিশেষ খতিয়ে দেখে তাঁদের মতামত দিতে পারেন।

১.১৪.১০. যেহেতু সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সবার জন্য সরবরাহ করবেন, তাই সেগুলি সরকারকেই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। নবম-দশম শ্রেণির জন্য বেসরকারি প্রকাশনা বিভাগকে সীমিত ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। একাদশ-দ্বাদশের বইপত্র আংশিক ভাবে বেসরকারি প্রকাশনের হাতে রাখলে ক্ষতি নেই।

১.১৪.১১ পাঠ্যপুস্তক হবে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, ভালো কাগজে ছাপা। শিশুদের মন্তব্য লিখে রাখার জন্য প্রতিটি পৃষ্ঠায় যথেষ্ট ফাঁকা অংশ রাখা প্রয়োজন। প্রামাণ্য ছবি ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক দেখে শিশুরা যাতে চাপ অনুভব না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.১৪.১২. শেষে বলা যায় পাঠ্যপুস্তক কোনো শেষ কথা নয়। শিশুকে নির্ভর করতে হবে অজস্র সহযোগী পাঠ ও কার্যাবলী উপর। বাস্তব-নির্ভর এই সমস্ত শিখন কৃত্য ও পাঠসমগ্রের সাহায্য নিয়ে শিশুরা উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, ও অনুমান করতে পারবে। শিশুকে প্রথমে দলগতভাবে ও পরে নিজস্ব ভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করবে এই পাঠ্য সম্ভারগুলি। মূল্যায়নও সেইভাবে পরিচালিত হবে। তাই পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সমজাতীয় পাঠ ও কাজকে ভিত্তি করেই শিশুর সামর্থ্য গড়ে উঠবে। এই সমস্ত 'সহযোগী শিখন সম্ভার' শ্রেণিকক্ষে মূলত দলগত পাঠ পরিচালনার সময় ব্যবহৃত হবে। তাই শ্রেণিকক্ষে গ্রন্থাগার নির্মাণ করে ঐ সম্ভারগুলি প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে হবে। এই সম্ভারগুলি নির্মাণের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে বলে কমিটি মনে করেন। প্রাথমিকে একটি এবং উচ্চ প্রাথমিকে আর একটি সমন্বিত সহযোগী শিখন সম্ভার রচনা করা যেতে পারে।

১.১৪.১৩ এমনভাবে এই সহযোগী শিখন সম্ভারটি নির্মিত হবে এই লক্ষ্যে যাতে শিখন কাজ চলার সময় নিয়মিত হাজিরা দেওয়া শিশুরা যেন পিছিয়ে না পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে পড়লেও শিখন সম্ভারের মধ্যে তার গতিতে ফেরার অজস্র কাজ ও চ্যালেঞ্জ যেন দেওয়া থাকে। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এটিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করবেন কমিটি তা আশা করেন।

১.১৪.১৪. প্রতিটি পাঠ্যবই এর সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য একটি গাইডবুক থাকবে। এগুলি শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রস্তুত করবেন সরকার তবে পাঠ্যবইটিকে সংযুক্ত করে এই guide book টিকে রচনা করতে হবে। তাই শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্যবইতে কখনোই শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশাবলি সংযুক্ত হবে না।

১.১৪.১৫. পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের জন্য একটি 'State Text Book Board' তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশেও এই ধরনের উল্লেখ আছে। এই বোর্ড একসঙ্গে সমস্ত পর্ষদ ও সংসদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই ২/৩ বছরের মধ্যেই যাতে পরিবর্তিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন। যারা পাঠ্যবই রচনায় থাকবেন, তাঁদের সঙ্গে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম নির্মাণের কাজে যুক্ত উপসমিতিগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। এছাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গের ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বহু পণ্ডিত, চিন্তাশীল ও উদ্যোগী শিক্ষক তাঁদের এ রচনার কাজে যুক্ত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকগুলি চূড়ান্ত করার আগে পাইলট টেস্টিং (Pilot testing) করা দরকার। রাজ্যে ভৌগোলিক ও জনবিন্যাসগত বিভাজন মাথায় রেখে এবং বিদ্যালয় নির্বাচন করে এই Testing করানো গেলে ভাল হবে। একই সাথে পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের পরই একটি পুস্তক সমীক্ষক সমিতি গঠন করে তাঁদের মতামত নিতে হবে। এই সমিতিতে এখন যাঁরা বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য আছেন তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া এর মধ্যে আরও অনেক মান্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিল্পীরাও থাকতে পারবেন।

১.১৪.১৬. সামাজিক সহযোগিতায় গড়ে উঠবে শিখনের সামগ্রিক পরিমণ্ডল ,তাই শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে হবে স্থানীয় সংস্কৃতি,শিল্প,কারিগরি দক্ষতা,ইতিহাস-ভূগোল রচনা, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, রোগের প্রবণতা ও তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা। এগুলি সামগ্রিক শিক্ষাক্রমের মধ্যেই সুসংহত (integrated)থাকবে। ফলে এজন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতেও সময় ও পরিসর খোলা রাখতে হবে।

(২) রূপায়ণ করতে শিক্ষা প্রশাসনে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ

২.১. সরকারকে আগামী ৩ বছরের (২০১৪) মধ্যেই অষ্টম শ্রণি পর্যন্ত এই পাঠক্রম সুচারু ভাবে সম্পন্ন করার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক (১ :৩৫ – উচ্চপ্রাথমিকে, ১ :৪০- প্রাথমিকে), শ্রেণিকক্ষ এবং পাঠক্রম অনুযায়ী নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরন্তু নতুন পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও শেষ করতে হবে এই সময়ের মধ্যে। এই পাঠক্রম যথার্থভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে যে সমস্ত সরকারি নির্দেশ প্রয়োজন হবে তা ইতিমধ্যে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতে হবে। উপরন্তু বেশ কিছু বিদ্যালয় (মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে ১৫০০ র বেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং প্রাথমিকে যেখানে ৩০০ র বেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা) কে ভেঙে ছোট করতে হবে। একই ক্যাম্পাসে পরিকাঠামো গড়ে ইউনিট ১ বা ইউনিট ২ এই ভাবে বিদ্যালয়গুলি ভেঙে দিতে হবে। এক একটি ইউনিট হবে স্বতন্ত্র্য বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীও সেখানে থাকবে। তবে একে অপরের মধ্যে অবশ্য আদান-প্রদান চলতে পারে। এই কাজটি আগামী ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

আগামী দিনে বালক-বালিকা সম্বলিত কো-এডুকেশন ব্যবস্থা বেশি করে চালু করতে হবে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দ্রুত সমীক্ষা চালিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক আছে এমন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকের পদ তুলে নিয়ে প্রয়োজন আছে এমন বিদ্যালয়ে তা প্রদান করতে হবে।

অন্যদিকে নতুন বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারেও দ্রুত School-mapping প্রক্রিয়াটিকে কার্যকরী করতে হবে। GIS Mapping সহ স্থানীয় স্তরে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে RTE অনুসারে নতুন বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। এখনও কার্যকরি হয়ে উঠে নি এমন বিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি নীতি প্রতিষ্ঠা কাম্য। 'প্রোজেক্ট দীপঙ্কর' কে সমস্ত জেলায় কার্যকারী করে তুলতে হবে।

২.২. প্রতিটি চক্রসম্পদ কেন্দ্র (CLRC) স্তরে **'বিদ্যালয়গুচ্ছ'** গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি চক্রসম্পদ কেন্দ্র ছোট হয়ে গেলে প্রতিটি কেন্দ্র পিছু একটি করে 'গুচ্ছসম্পদ কেন্দ্র' গড়া বাস্তব সম্মত হয়ে উঠবে। এই গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রগুলি পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন পদ্ধতি বাড়ির কাজ- এই তিনটি বিষয় নিয়ে মূলত কাজ করবে। এ বিষয়ে যাবতীয় অভিনব ভাবনা, নতুন কৃত্যালি এবং মূল্যায়নপত্র পরিকল্পনা করাই হবে বিদ্যালয় গুচ্ছগুলির কাজ। একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (S.I. of Schools) এর অধীনে এই গবেষণার কাজ নিবিড়ভাবে চলবে। এই কাজ কেমন হচ্ছে তার জন্য জেলা ও রাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এই সম্পদ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবেন এবং তাদের রিপোর্ট করবেন।

২.৩. শিক্ষা প্রশাসন স্বয়ংক্রিয় হবে। শিক্ষককে তাঁর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। বিদ্যালয়স্তরে প্রধান শিক্ষককে 'academic head' হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য প্রধান শিক্ষককে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সহ একটি বার্ষিক পরিকল্পনা (School development plan) রচনা করতে হবে এবং সেটি School Managing Committee এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জমা দিতে হবে। School Development plan নির্মাণের সময় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি একটি বড় ভূমিকা থাকবে। এই সমিতির সদস্যরা এলাকার যাবতীয় তথ্য এবং মানুষের মতামত এই পরিকল্পনার মধ্যে সংযুক্ত করার চেষ্টা করবেন। এই পরিকল্পনার একটি বড় অঙ্গ হল শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে আরও জনমুখী করা যায়। যেহেতু নতুন পাঠক্রমে এমন অনেক বিষয় এসেছে যেখানে ঐ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু দক্ষতার সদব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয়ত শিক্ষকের পক্ষে সমস্ত বিষয়ে সমান দক্ষতা দেখানো সম্ভব নয় । তাই পরিচালন সমিতির সদস্যরা সারা বছরের জন্য স্থানীয় সম্পদ সদব্যহবাহরের একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং তা শিশুদের জন্য ব্যবহার করবেন। আসলে পূর্বতন ব্যবস্থায় VEC বা Management Committee র কর্মসূচি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে সভায় আসতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এবার তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে সংযুক্ত করতে হবে যাতে উন্নয়নের পরিকল্পনায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এই পরিকল্পনা খতিয়ে দেখে যাতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে মানোন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন সেজন্য পরিদর্শককে সমর্থ করে তুলতে এক ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' স্তরে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হবেন Academic Head I অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁর এলাকার জন্য সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা করে ব্লকস্তরে সহবিদ্যালয় পরিদর্শক (Block) এর কাছে সেটি জমা দেবেন। প্রতিটি 'গুচ্ছ'র জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সববরাহ করা, RTE অনুসারে সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা, তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের মান নিরূপণ করা এবং শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজগুলি সহ-বিদ্যালয় পরিদর্শক (Block) পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করবেন। এজন্য সহ-বিদ্যালয় পরিদর্শকের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (অ্যাকাডেমিক) কে জেলা স্তরে Academic Head হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এই পদে এমন একজন পরিদর্শককে নিযুক্ত করতে হবে যিনি এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারা, কার্যকারিতা ও বিদ্যালয় কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপরেখা সম্পর্কে অবহিত। DIET কে Academic support দেওয়ার সপক্ষে শিক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (অ্যাকাডেমিক) একদিকে DIET, PTTI, B.Ed College গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে Academic supervision এর ব্যবস্থা করবেন, অন্যদিকে প্রতিটি ব্লক থেকে আসা বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করে জেলাস্তরে পরিকল্পনা করবেন। উপরন্তু জেলায় শিক্ষাসংক্রান্ত যতগুলি প্রকল্প চলছে যেমন- সর্বশিক্ষা অভিযান, Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education, মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, RTE অনুসারে সহায়তা ও সমস্যা নিরসন ইত্যাদি কর্মসূচির জেলা প্রকল্প আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ঐ কাজ করার জন্য WBES Cader ভুক্ত কোনো যোগ্য আধিকারিককেই এই দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন I সাধারণ প্রশাসনের কোনো আধিকারিককে দায়িত্ব দিয়ে এই কাজ ঠিকভাবে হবে বলে কমিটি মনে করেন না।

শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কাজ (যেমন জেলাপরিদর্শক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, অ্যাকাডেমিক ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ ও মাধ্যমিক বোর্ডের বিভিন্ন কর্মসূচি) সমন্বিত করে জেলাস্তরেই তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় একজন করে উপ-শিক্ষা অধিকর্তার পদ নতুনভাবে সৃষ্টি করতে হবে। সমস্ত জেলা পরিদর্শক তাদের পরিকল্পনা জেলার জন্য সৃষ্ট পদে নিযুক্ত উপ-অধিকর্তার কাছে জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট উপ-অধিকর্তা জেলার জন্য একটি সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করবেন। প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অফিসটি জেলা স্তরে রাজ্য অধিকর্তার প্রতিভূ ও তার দ্বারা ক্ষমতায়িত হয়ে সমস্ত সমস্যার নিরসন করতে পারবে। তিনি জেলা সমাহর্তা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলার বিধায়ক এবং মন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সফল ভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করবেন। রাজ্যস্তরে একজন যুগ্ম-অধিকর্তা কে Academic Head হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং কাজ পরিচালনার জন্য তাকে SCERT র সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। তিনি একাধারে SCERT র অতিরিক্ত অধিকর্তা (Academic) এবং বিভিন্ন প্রকল্পগুলির রাজ্য প্রকল্প অফিসে অতিরিক্ত অধিকর্তা (Academic) হিসাবে কাজ করতে পারেন। SCERT, DSE অফিস এবং রাজ্য প্রকল্প অফিসকে যোগ্য মানব সম্পদ ও প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। SCERT, রাজ্য প্রকল্প অফিস ও DSE অফিস থেকে মনোনীত শিক্ষাবিদ্ ও আধিকারিক ও পরিদর্শকদের নিয়ে গঠিত রাজ্যস্তরে এই দলটি সমগ্র অ্যাকাডেমিক কাজ পরিচালনা করবেন যুগ্ম-অধিকর্তার নেতৃত্বে। SCERT কে রাজ্যের Academic authority হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ ও অন্যান্য সহযোগিতা দান করে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। SCERT প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রমে সঠিক রূপায়ণ সংক্রান্ত academic support প্রদান করবেন। অন্যদিকে DSE এবং বোর্ড, বিভিন্ন জেলা

থেকে আগত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। সর্বশিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ academic বাতাবরণ নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত।

২.৪. একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজের ক্ষেত্র ২৫ টির বেশি বিদ্যালয় রাখা যাবে না। তাই এগুলিকে ভেঙে ছোট করতে হবে। প্রয়োজনে এ রাজ্যে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জন্য আরও ১০০০ পদ নতুনভাবে সৃষ্টি করতে হবে। Public Service Commision এ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদটির নিয়োগ পদ্ধতিতে আরও শিক্ষা-বিষয়ক ভাবনা ও শর্ত আনতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এমন আধিকারিক নিযুক্ত হবেন যাঁরা শিক্ষার নয়া অভিমুখ সম্পর্কে অবহিত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ। অবশ্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর এবং প্রাক্-চাকুরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। অন্যদিকে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করতে হবে। নিয়োগের সময় এই ৫ বছর কীভাবে তিনি বিদ্যালয় সংগঠনে ব্যয় করেছেন তাও তাঁর নিয়োগের অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

অন্যদিকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নির্বাচনে অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে সমস্ত প্রধান শিক্ষক অন্তত ৫ বছর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে হবে PSC কে। তাই একাধিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তত দুটি ভাষায় বলতে পারা, লিখিত কাজে দক্ষ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে সাবলীল এমন প্রার্থী নির্বাচন করা দরকার । Ph.D র জন্য গবেষণার কাজে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ এবং গত পাঁচ বছরে সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের হাল ফেরাতে পেরেছেন এমন প্রধান শিক্ষককে এই কাজের জন্য নির্বাচন করা যায়। তার পেশাগত যোগ্যতা থাকবে যথেষ্ট উন্নত মানের।
অন্যদিকে DIET এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক করণগুলির বিভিন্ন আবিষ্কারিক বা শিক্ষকতার জন্য নির্দিষ্ট পদগুলিকে Common Cadre System এর মধ্যে আনলে প্রয়োজনমত পদ পূরণ যেমন সহজ হবে তেমনি পদগুলিতে academic ভাবনার ছোঁয়া লাগবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমোশন ও বদলিরও সুযোগ বাড়বে।

২.৫. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ধারাও এ জন্য বদলে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ১০ বছর ধরে কোনো বিদ্যালয়ে 'সাফল্য' এর সঙ্গে কাজ করেছেন এমন যোগ্য শিক্ষককেই এই পদে নির্বাচন করতে হবে। তা ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে। গবেষণায় সাফল্যকে অন্যসূত্র থেকে জেনে নিতে হবে তিনি কেমন সামর্থ্যে কাজ করছেন। এছাড়া দুটি ভাষায় দক্ষতা এবং সর্বোপরি পরিচালনা সংক্রান্ত সামর্থ্যকে জোর দিতে হবে এই নির্বাচনে।

২.৬. প্রধান শিক্ষকের পদটিকে একটি উন্নততর management post হিসাবে দেখতে হবে। বিদ্যালয়স্তরে প্রস্তাবিত পাঠক্রমের সাফল্যের জন্য প্রধান শিক্ষককেই মূল দায়িত্ব নিতে হবে। ব্যর্থতার দায়িত্ব তাই তার উপর বর্তাবে। তাই প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি এ মুহূর্তে একান্ত জরুরি। School Management and Developement Committee (SMDC) যেমন থাকবে, তেমনি প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করার জন্য শিক্ষকদেরও বিভিন্ন উপসমিতি থাকবে । একটি যৌথ পরিচালন ক্ষেত্রে তৈরি করতে হবে বিদ্যালয় স্তরে। প্রধান শিক্ষক হবেন ঐ বিকেন্দ্রিত যৌথ দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালন ব্যবস্থার মূল কান্ডারী। তবে কোনো ক্ষেত্রে বিতর্ক উত্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষকের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের official কাজগুলিকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য করণিক (আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ) নিয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঐ official কাজগুলিকে সমাধান করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের এই দায়িত্বগুলিকে যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে। এমন কি Mid-day Meal পরিচালনার দায়িত্বে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাকে কীভাবে কমিয়ে দেওয়া যায় তার কথাও সরকারকে চিন্তা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক শিশুদের সামর্থ্য অর্জনের পরিবেশ রচনায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করবেন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এবং বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ রেখে বিদ্যালয়টিকে 'ভাল বিদ্যালয়' এর স্তরে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। Academic authority হিসাবে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজ দেখা, বোঝা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করার উদ্যোগ তাঁকে নিতেই হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেহেতু করণিক নেই তাই বিভিন্ন রিপোর্ট রিটার্নের কাজগুলি সবই চক্রসম্পদ কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হবে। প্রধান শিক্ষকগণ অন্যান্য

শিক্ষকদের সম্পর্কে বছরে একটি Confidential Performance Report (CPR) জমা দেবেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে। তার ভিত্তিতে শিক্ষকদের grading এবং চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২.৭. অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (SI/S) এর করণটি যেটি চক্রসম্পদ কেন্দ্র (CLRC) নামে পরিচিত সেটিকে স্থানীয় স্তরে সমস্ত শিক্ষাগত ক্রিয়াকান্ডের মূল কর্মস্থল (Hub) হিসাবে পরিণত করতে হবে। এলাকায় ২৫ টি (প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সব মিলিয়ে) বিদ্যালয় নিয়ে স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা, RTE ফলপ্রশু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, স্থানীয় অভিযোগগুলি জন্য যথাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি সমস্ত বিদ্যালয়ে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ এ কেন্দ্রে করতে হবে। কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে সাফল্য পাচ্ছে বা অসফল হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও বিশ্লেষণ রক্ষিত হবে এই চক্রসম্পদ সঙ্গে।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কীভাবে এ তথ্য সংগ্রহ করবেন ? এটি একটি বিস্তৃত কর্মসূচি তবে শিক্ষার স্বার্থে তৃণমুল স্তরে এক সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আধিকারিককে এ ভার নিতেই হবে বলে কমিটি মনে করে। একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষা সহযোগী (Resource persons) থাকবেন। তাঁরা অবশ্যই কর্মরত শিক্ষক হবেন। তাঁদের নির্বাচন সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা থাকবে। এই নির্দেশিকা অনুকরণ করে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এই ৫ জনকে তাঁর এলাকা থেকে বেছে নেবেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতামতই চুড়ান্ত। শিক্ষার নয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত, বিভিন্ন কাজে দক্ষ, প্রশিক্ষণে পারদর্শী সর্বোপরি প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ এমন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে তাঁদের Resource person হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আধিকারিকের নেতৃত্বে এই Resource person বিদ্যালয়গুলিতে গুণগতমান উন্নয়নের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন। নয়া শিক্ষাক্রমে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণেচেষ্টা চালাবেন এবং ঐ CLRC টির কার্যকারিতাকে আরও বেশি দৃষ্টান্তমূলক করে তুলবেন। ঐ শিক্ষা সহযোগীদের ২০ দিনের একটা নিবিড় প্রশিক্ষণ জেলাস্তরে DIET এ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে তাঁরা সার্বিক গুনমান পরিচালনার (Total Quality Management-T.Q.M.) ধারণা লাভ করে তা স্থানীয়স্তরে ব্যবহার করবেন। এ বিষয়ে কীভাবে প্রধান শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষকদের সহযোগিতা করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আর একটি কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করবেন । তা হল বছরে দু'বার (ন্যূনতম একবার) RP দের সাথে হঠাৎ করে প্রতি বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন এবং সারাদিন ঐ বিদ্যালয় উপস্থিত থেকে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষকদের কাজ অনুষ্ঠিত, CCE র গুণমান নির্ধারণ করা, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা নজর দেওয়া এবং শিশুদের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা। মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি তাঁরা CLRC স্তরে রক্ষা করবেন এবং প্রতিটি শিশুর সামর্থ্যভিত্তিক অগ্রগতির নথি প্রস্তুত করবেন। শিক্ষকদের কাজের মান সম্পর্কে একটা নথি তৈরি করবেন। প্রধান শিক্ষকের কার্যকরিতা ও কর্মকুশলতা নিয়েও তাঁরা তথ্য রক্ষা করবেন। অন্যান্য প্রাপ্ত নথির সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ ফলাফলের নথিটি যুক্ত করে শিশু, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সাফল্য সম্পর্কে একটা সামগ্রিক রিপোর্ট রচনা করবেন। কোনো বিদ্যালয় পিছিয়ে পড়লে তাকে সাহায্যের জন্য শিক্ষা সহযোগীরা ঘনঘন বিদ্যালয়ে গিয়ে সাহায্য করবেন। অন্যদিকে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রথমে প্রধান শিক্ষক পরে অন্যান্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্বও এই CLRC র উপর থাকবে। প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি যে কোনো বিচ্ছিন্ন একটি দলিল নয়, এটি যে সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত হয়েছে তা বুঝে প্রত্যেক শিক্ষক এবং আধিকারিককে নিজ নিজ দায়িত্বপালন করতে হবে। সচেতন বিচ্যুতির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য সরকারকে সবার জন্য service rule টি নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে।

২.৮. বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন ২০০৯ এ ৬ থেকে ১৪ বছর শিশুদের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষার সুপারিশ আছে। কিন্তু এরাজ্যে ৫ বছরের শিশুদের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য চালু নির্দেশ রয়েছে। ফলে সর্ব ভারতীয় প্যাটার্নের সঙ্গে এরাজ্যের ব্যবস্থাপনা সবটা মেলে না। অন্যদিকে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের সময় যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যালয়ছুটের সংখ্যা ও বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশু সামগ্রিক চিত্রেও দেখা যায় বেশ কিছু গরমিল। মিড ডে মিলের পরিসংখ্যান এবং অঙ্গনওয়াড়ি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রের পরিসংখ্যানে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। ১৪ বছরের পরিবর্তে

কার্যত ১২+ পর্যন্ত শিশুদের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রারম্ভিকস্তরের সমস্ত তথ্য জমা দিতে হয়। এটাও সাংবিধানিক নির্দেশকে লঙ্ঘন করে। ফলে কমিটি বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন:-

ক) প্রথম শ্রেণির ভর্তির বয়স ৬ বছর করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাবর্ষে প্রথম মাসে যদি শিশুর বয়স ৫ বছর ৯ মাস হয়ে থাকে তবে সেও ভর্তি হতে পারবে।

খ) বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন ২০০৯ এর ১১ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে '৩ বছর বয়সের পরে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য তৈরি করতে বা ৬ বছর বয়স অবধি সব ছেলেমেয়ের প্রথম শৈশবের যত্ন আর শিক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক সরকার প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।' আমাদের রাজ্য ব্যবস্থাটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি দেখাশুনো করে। তাই এই বিষয়টি দক্ষতা সঙ্গে সম্পন্ন করতে নিম্নলিখিত দুটি পদক্ষেপের মধ্যে যে কোনো একটি নিতে পারেন:-

ক) অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা অধীনে ৬ বছর বয়স অবধি প্রাক্ প্রাথমিক কর্মসূচিটিকে নিবিড়ভাবে করা যাতে এই অধিকারটি সঠিকভাবে রক্ষিত হয়।

খ) ৫ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ১ বছরের জন্য প্রাক্ প্রাথমিক ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা এবং অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের বিযুক্ত করা।

সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠক্রম ও কৃতসূচি তৈরি করবে এবং এরাজ্যে যাতে বিষয়টি সঠিকভাবে চালু হয় তার ব্যবস্থা করবে।

২.৯. ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সারা রাজ্যে এ ধরণের কয়েকটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে গুচ্ছ স্তরে শিখন মান উন্নয়নের একটি রূপরেখা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করেন। আগামী শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারী মাস থেকেই সারারাজ্যে অন্তত ২০ টি চক্রসম্পদ কেন্দ্র বাছাই করে (প্রতিটি জেলায় একটি করে) তাদের অধীনে একটি বা দুটি করে পঞ্চায়েতে পাইলট প্রকল্প শুরু করা যায়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নতুন পাঠক্রমের অভিমুখটি বিবেচনা করে বিদ্যালয়গুচ্ছের অবতারণা করা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থা সঙ্গে একটি বাস্তব সম্মত যোগাযোগ তৈরি করা । অন্যদিকে স্থানীয় সহযোগিতাকে ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের পরিবেশ আরও কার্যকর করে তোলা। এর সঙ্গে মূল্যায়নপত্র নির্মাণ, বাড়ির কাজ নিয়ে গবেষণা এবং অভিনব প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে-পড়া শিশুকে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই উপযুক্ত সাহায্য প্রদানের মতো বিভিন্ন কৃত্যালিও হাতে নিতে পারে এই গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র। সরকারি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে পঠন-পাঠনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে ব্যবস্থাটিকে আরও ফলপ্রসু করে তুলতে হবে। এখানে শিক্ষক, পিতা- মাতা, পঞ্চায়েত, প্রধান শিক্ষক এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষা সহায়কদের একটি যৌথ পরিচালন ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে উন্নয়নের পরিমণ্ডল। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Development Plan) সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃত্যালি এখানে যুক্ত হয়ে পড়বে সমস্ত ব্যবস্থাপনায়। অন্যদিকে নতুন পাঠক্রম অনুসারে কিছু কিছু অংশ পরীক্ষা করেও দেখা যেতে পারে এটা দেখার জন্য যে এই দলিল সত্যিই বাস্তবসম্মত হয়েছে কিনা।

এই প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান সর্বশিক্ষা অভিযানের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

বিষয়-ভিত্তিক পাঠক্রমের রূপরেখা

(খসড়া)

পাঠক্রমের ধারণা

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে যে সকল কর্মসূচি নির্বাচন করা হয় এবং সচেতনভাবে পরিচালনা করা হয়, তাদের সমবায়ই হল পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম, কিন্তু পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের সমষ্টি নয়। যে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা যা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করে। সেগুলি সবই পাঠ্যক্রমের উপাদান। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে দুটি পর্যায়ে প্রক্রিয়ার সমন্বয়, - ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া (individual process) ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Socialization process)। পাঠ্যক্রম প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালয়ে বা তার বাইরের পরিবেশে অর্জিত সকল রকম অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়িত একক। এটি কোনো স্থায়ী ধারণা নয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু (Context), পদ্ধতি (Teaching Method), উদ্দেশ্য (Objective) এবং মূল্যায়ন (Evaluation / Assessment) এই চারটি উপাদানের ক্রিয়াশীল সমন্বয়ে গঠিত হয়। পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ধারণাটি জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম (২০০৫) অনুযায়ী একটি সমন্বয়ী ধারণা। নির্বাচিত অভিজ্ঞতা গুলির যথার্থ সমন্বয় সাধনের মধ্যেই নিহিত আছে এর সাফল্যের সম্ভাবনা বা কার্যকারিতা।

<u>পাঠ্যক্রমের কার্যাবলি:</u> (i) পাঠ্যসূচির যথাযোগ্য ক্রম (Appropriate order) নির্ধারণ করা।

(ii) ভবিষ্যৎ সামাজিক চাহিদাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।
(iii) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করা।
(iv) জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
(v) শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে সক্রিয় করে তোলা।
(vi) শিক্ষার্থীকে দৈহিক ভাবে সক্রিয় করে তোলা।
(vii) বিষয়বস্তু শিক্ষণের কৌশল সম্পর্কে সুনিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা।
(viii) শিক্ষণীয় বিষয় সমূহে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করা ও নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা।
(ix) মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা।

<u>পাঠ্যক্রমের কাঠামো:</u>

(i) **<u>বিষয় কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম:</u>** প্রথাগত পাঠ্যবিষয়গুলির (ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ii) **<u>কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম:</u>** শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহ নিঃসৃত অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের বা সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।এই পাঠ্যক্রমে দৈহিক কার্যাবলি, পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি, গঠনমূলক কার্যাবলি, সৃজনমূলক কার্যাবলি ও সামাজিক কার্যাবলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। নির্বাচিত কাজগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

(iii) **<u>অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম:</u>** দৈহিক বা মানসিক বা জ্ঞানমূলক ও দক্ষতামূলক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে এই পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়।ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তি অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা; দর্শন, ধর্ম, সমাজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা হল শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা; কলা, হস্তশিল্প, সংগীত ইত্যাদি কর্মের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞতা গুলি হল শিক্ষার্থীর কর্মমূলক অভিজ্ঞতা;

(iv) **<u>অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রম বা কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম:</u>** এই পাঠ্যক্রমে প্রথাগত পাঠ্যবিষয়গুলিকে পৃথকভাবে পরিবেশন না করে, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-স্তরে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এই পাঠ্যক্রমে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান্সামগ্রীর সমন্বয় ঘটানো হয়। এই বিশেষধর্মী শিক্ষায়

সহায়তা করে না। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের জন্য অনুবন্ধের নীতি (Principle of Correlation) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে গতানুগতিক বিষয়সমুহের অন্তর্গত আপাত পৃথক ধারণা গুলির মধ্যে সংযোগ ঘটানো হয়। এই পাঠ্যক্রম যার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা বা তার স্বতন্ত্রের কথা বিবেচনা করা হইয়না সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনই প্রাধান্য পায়। অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রমে পাঠ্যবিষয় সমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করা হয়, যথা

- ✓ **মানব সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা-** এই অভিজ্ঞতাসমূহ একত্রে মানবিক বিজ্ঞান (Humanities) নামে পরিচিত। সাহিত্য, কলা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান এই শাখায় অন্তর্গত।
- ✓ **প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা**-বিশ্ব প্রকৃতি (Nature) এই অভিজ্ঞতাসমূহের কেন্দ্রবিন্দু,প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন পদার্থবিদ্যা,রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা,প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি এর অন্তর্গত।
- ✓ **সামাজিক অভিজ্ঞতা-** শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে কেন্দ্র করে অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রমের এই অংশে ভূগোল, ইতিহাস, পৌরবিদ্যা, অর্থনীতির ন্যায় পাঠ্যবিষয়গুলির সমন্বয় সাধন করা হয়।

এই পাঠ্যক্রমে ধারণা (Concept) বা জ্ঞানের (Knowledge) পুনরাবৃত্তি ঘটার সুযোগ থাকে না। ফলে শিক্ষাককে একই তথ্য শ্রেণিতে এক বারের বেশি উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয় না; অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের একই বিষয়বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে বারবারের অনুশীলন করতে হয় না। অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রমে অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা হয় এবং সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাগুলির প্রয়োগ সীমাকেও বিস্তৃত করা হয়। এই পাঠ্যক্রম সমাজ অন্তর্গত সকল শিশুর শিক্ষার মধ্যে সমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে থাকে। ফলে সকল শিক্ষার্থীই সামাজিক সংস্কৃতির প্রবহমান মূল ধারার হওয়ায় পরিচালনা করা শ্রেণিকক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়। শিক্ষায় সমতা আনার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ গুণাবলিকে খর্ব করা এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য নয়, বরং এই পাঠ্যক্রম বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ জাতীয় একই কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম রচনা করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

পাঠ্যক্রমটির ত্রুটি/ সীমাবদ্ধতা সমূহ

- ✓ মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি স্থির করা হলেও পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলিকে সে সকল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার কোনোরকম প্রয়াস করা হয় নি।কোন্ বিষয়াংশ কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে,তার কোন সংকেত পাঠক্রমের মধ্যে নেই।ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতা থেকে গেছে। শিক্ষার্থীকে পরিতৃপ্ত করার (অতিরিক্ত বিষয় নির্বাচন ছাড়া) কোনো বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
- ✓ এই পাঠ্যক্রমের বিষয়সূচির সঙ্গে সমাজের অগ্রমুখী চাহিদার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বর্তমান সমাজের চাহিদার তুলনায় পশ্চাৎবর্তী।
- ✓ শিক্ষার্থীর সৃজনক্ষমতা বিকাশের কোনো সুযোগ নেই।
- ✓ পাঠ্যক্রম রচনা সংক্রান্ত সমন্বয়ের নীতিকে গ্রহণ করা হলেও তা শুধুমাত্রা পরীক্ষা পরিচালনার জন্য হয়েছে।
- ✓ পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলির বিন্যাসের ক্ষেত্রে কাঠিন্যক্রম বিচার হলেও মনোবৈজ্ঞানিক ক্রম মানা হয় নি। এই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে এই পাঠ্যক্রম সক্ষম হয় নি।
- ✓ সক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করা হয় নি।
- ✓ শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা মূল পাঠ্যক্রমের একটি পরিশিষ্ট অংশে পরিণত হয়েছে।

সুসংহত পাঠক্রম
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য

ক) ৫+ ও ৬+ শিশুর জন্য পাঠক্রম হবে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে শিখনের মূল অভিমুখ হল ভাষা শেখা। শিশুর আশেপাশের পরিবেশকে সেক্ষেত্রে আধার বা ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ভাষার দক্ষতা শোনা-বলা-দেখা-বোঝা-পড়া-লেখার আঙ্গিকে হলে এই দুটি শ্রেণিতে তা হবে মূলত শোনা-বলা ও পড়ার শিক্ষা। দ্বিতীয় শ্রেণির শেষে প্রতিটি শিশুকেই প্রথম ভাষায় ৫/৬ টি শব্দ সম্বলিত, বাক্য অর্থপূর্ণভাবে পড়ার সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে যে যে লক্ষ্যমাত্র ধার্য হতে পারে-

i) ভেঙে উচ্চারণ না করে ৪/৫ অক্ষর বিশিষ্ট গোটা শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণেও অভ্যস্ত থাকবে।

ii) ৫/৬ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য অর্থপূর্ণভাবে যতিচিহ্ন বা ক্ষণস্থায়ী বিরতি সহকারে পড়তে পারবে। যে যে জোড়া শব্দ একসঙ্গে উচারণ করলে পঠন অর্থপূর্ণ হয়, তার প্রকৌশলগুলি নিজেই শিখে নিতে পারবে।

iii) ৪/৫ টি বাক্য সহযোগে কোনো গদ্যাংশ একটানা পড়তে পারবে এবং একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যটির সম্পর্ক ও গদ্যাংশে নিহিত অর্থ ও মূলশব্দগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।

iv) বাক্যগুলিকে এলোমেলো করে দিলে তা সাজিয়ে অর্থপূর্ণ গদ্যাংশে পরিণত করতে পারবে।

v) গদ্যাংশে ব্যবহৃত শব্দের সম্পর্ক শব্দভাণ্ডার নির্মাণ করতে পারবে এবং বিপরীতার্থক শব্দও অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কার করতে পারবে।

vi) কানে শব্দ শুনে পাঠ্যাংশে ঐ শব্দটি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চিহ্নিত করতে পারবে।

vii) মিনিটে অন্তত ৮০/৯০ টি শব্দ ঠিক উচ্চারণে পড়তে পারবে।

viii) বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ থেকে নিজে অনুরূপ অনেক শব্দবন্ধ নির্মাণ করতে পারবে।

ix) শব্দের ধ্বনিগত সমতাকে মাথায় নিয়ে অনেক অর্থপূর্ণ বা অর্থহীন শব্দ তৈরি করতে পারবে।

x) ছোট ছোট বাক্য লিখতে পারবে, বাক্য বাড়াতে পারবে এবং দুটি বাক্য সংযুক্ত করতে পারবে।

xi) বিভিন্ন ছড়া, শিশুকবিতা মুখস্থ করে তার মধ্যে যে ছন্দের মজা এবং অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করতে চেষ্টা করবে।

খ) একইভাবে প্রথমভাষার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার শব্দগুলিকেও চর্চা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সহজ সহজ নির্দেশ, উপদেশ এবং বক্তব্য শোনা ও বলার চর্চা রাখতে হবে। দ্বিতীয় ভাষাতে তাই কোন আলাদা পাঠ্যবই সুপারিশ করা হয় নি। প্রথম ভাষাটির সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় ভাষাটিতে শব্দগুলি ব্যবহার করা শিখবে। এর জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্মাতাগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ভণ্ডার গড়ে তা দিয়ে তাঁদের কৃত্যালি তৈরি করবেন। প্রথম শ্রেণিতে অন্তত ৫০০ শব্দ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্তত ১৫০০ শব্দ নতুনভাবে শিশুর সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে হবে। প্রথম শোনা এবং পরে দেখা বা পড়ার ভিত্তিতে তা তৈরি করতে হবে। দেখা –শোনা-বলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এই দুটি শ্রেণিতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুর বলার সুযোগও রাখতে হবে। ধ্বনিতে বিভাজন ও শব্দের ধ্বনির ব্যবহার শব্দ উচ্চারণের পৃথক পৃথক প্রকৃতিকে নিজে নিজে বুঝতে সাহায্য করতে হবে শিশুকে। তবে তা হবে অনেকাংশে দ্বিভাষাযুক্ত।

গ) দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষকের মোবাইল ফোনটিকে দ্বিতীয় ভাষা প্রশিক্ষণের বিশেষ একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষায় শোনা-বলার কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারবে এমন শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম ধরে নিয়েই কমিটি এই অভিনব প্রকরণটি সুপারিশ করছেন। শিক্ষকের করণীয় কাজগুলিকে দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণে সমৃদ্ধ করে তা শিক্ষকের মোবাইল ফোনে ভরে দিতে হবে, যাতে তিনি বারেবারে তা নিজে দেখতে অথবা শুনতে পান। অনেকক্ষেত্রে ঐ উপকরণটিকে শিক্ষা প্রযুক্তির সাহায্যে শ্রেণিকক্ষেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যাই হোক, শিক্ষককে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠে সংযোজিত শব্দ বাক্য ও কাজগুলি বুঝে নিতে হবে এবং তার উচ্চারণ সঠিকভাবে শিখে নিতে হবে। ওগুলিকে ব্যবহারের রীতি এবং প্রকৌশল বুঝে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের মতো করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া CLRC স্তরে audio-visual উপকরণ রেখে বা মাঝে মাঝে Video conferencing র মাধ্যমে শিক্ষকদের সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

ঘ) যেহেতু পরিবেশকে কেন্দ্র করেই এই দুটি শ্রেণির পঠন-পাঠন ও অন্যান্য কারযাবলী, পরিচালিত হবে, তাই এইবিষয়ে কয়েকটি থিম (theme) কে কেন্দ্র করে ভাষা-শিখনের কাজটি পরিচালনা করলে, শিশু শুধু ভাষা শিখবে না, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটিকেও চিনতে পারবে। তাই পরিবেশ পরিচিতি কে দুটি ভাষা শিখনের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

ঙ) গণিতের সংখ্যা এবং চিহ্ন এবং প্রক্রিয়া (operation) এর মধ্যে ও একটি বিশেষ ধরনের ভাষা আছে। সাধারণ ভাষা শিখনের কাজের সঙ্গে গাণিতিক ভাষা-শিখনের ব্যবস্থাও মিশিয়ে দিতে হবে এমনভাবে যাতে শিশু বুঝতে না পারে যে তাকে 'গণিত' নামে একটি বিশেষ বিষয় পড়ানো চলছে। তাই এই দুটি শ্রেণিতে, গণিত ধারণা সৃষ্টিতে, প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে আধাবাস্তব এবং তার পরে অধিবাস্তব বা বিমূর্ত (abstract) ধারণায় যাত্রা করতে গণিতকে নিয়ে গল্প, মজা, খেলা, ম্যাজিক এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলার ব্যাপক প্রয়োগ করতে হবে। এটি মূলত ভাষারই চর্চা। তবু দ্বিতীয় শ্রেণির শেষে যে লক্ষ্যমাত্র পূরণ করতে হবে তা হল তিন সংখ্যা অংকের মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সাধারণ গাণিতিক ধারণা ও তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী বুঝে নিতে পারে। এছাড়া ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, লম্বা-খাটো, বেশি-কম, বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যাটানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং ছবির মাধ্যমে মানসাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

চ) উৎপাদন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কৃত্যসূচিকে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এই দুটি শ্রেণিতে। ভাষা-শিখনের স্বার্থে এই কাজগুলি সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমেই পরিচালনা করতে হবে। যেমন, শিক্ষকের কাছে শিশু একটা নদীর বর্ণনা শুনে নিজের মতো করে তা আঁকতে চেষ্টা করবে। ছবির গুণমান এখানে মোটেও বিবেচ্য নয়, বরং শিশু কীভাবে নিজের সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে ঐ বর্ণনাটির জন্য অংকনের ভাষা প্রয়োগ করছে তাই এখানে

বিবেচ্য। শিশুর অংশগ্রহণই মূল্যায়নের মূলকথা। শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন কাজকে শিশুর ভাষা ও গাণিতিক ভাষা শিখনের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে এবং সেইমত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে।

ছ) স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষাও পূর্বের বিষয়টির মতো যুক্ত হবে। গানের ছলে শারীর চর্চা স্বাস্থ্যনীতির নিয়ম মাফিক চর্চা ইত্যাদিকে ভাষাচর্চার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এই দুটি শ্রেণিতে। তাই অন্যান্য সমস্ত খেলাধুলার সঙ্গে ব্রতচারীকে পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরন্তু মূল্যবোধের শিক্ষা, শান্তির জন্য শিক্ষা, শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠা কিছু গুণাবলির চর্চা কে সুদৃঢ় করতেও ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার চর্চা, সৃজনমূলক কাজ ও শারীর ও স্বাস্থ্য চর্চা যুক্ত করতে হবে। দেশ সম্পর্কে জানা, গান শোনা, স্থানীয় মন্দির মসজিদের কাহিনি শোনা, স্থানীয় ইতিহাস খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতামূলক পাঠ যুক্ত করতে হবে। পাশ্ববর্তী গ্রাম, জঙ্গল, পাহাড় বা জলাশয় সম্পর্কে তার অসীম রহস্য বোধকে পরিতৃপ্ত করার জন্য ও এই কাজগুলিকে চর্চা করার দরকার। এতে তাঁর ভাষাচর্চা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হতে পারে।

জ) সর্বোপরি এই ভাষাচর্চা কয়েকটি থিম (theme) কে কেন্দ্র করে চলবে। প্রথম শ্রেণিতে ৫/৬ টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৬/৭ টি থিম (theme) ভাবা হয়েছে। এই থিমগুলি সংযোজনের সময় 'সহজ-পাঠ' কেও অনুরূপ ভাবনায় ঢেলে সাজাতে হবে। সহজ পাঠের একটি একককে কেন্দ্র করে এক একটি থিম নির্মাণ করতে হবে।

পাঠক্রম

বিষয় : প্রথম ভাষা [বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা]

মানুষ ভাবে ভাষা দিয়ে। সুতরাং, মানবজাতির চিন্তার বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে তার ভাষাদক্ষতার উপর। একটি শিশুকে যদি প্রাথমিক স্তর থেকে তার প্রথম ভাষায় দক্ষ করে তোলা যায় তাহলে পরবর্তীকালের সে ক্রমশ চিন্তার নানা ব্যাপক এবং জটিল ক্ষেত্রে সাবলীলতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে। নতুন শিক্ষাক্রমে এই বুনিয়াদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিককালেরNCF 2005 এবং RTE 2009 দুটি শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। সেই নথিদুটিতেও প্রথম ভাষা (তৃতীয়/গৃহভাষা)-র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুলাংশে অনুসরণ করা হয়েছে ঐ নথিদুটিকে ।

প্রথম ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যদি- (১) অভিজ্ঞতা এবং প্রাত্যহিক নানা পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত রেখে প্রথম ভাষা শেখানো যায় এবং (২) সেই শিখনের মাধ্যম যদি হয় হাতেকলমে কাজ, তাহলে দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে সে ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। নতুন শিক্ষাক্রমে এই দুটি দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে নতুন পদ্ধতিতে ভাষা শিখনের সোপান তৈরি করা হয়েছে বলেই শিক্ষকের ভূমিকা হয়ে উঠেছে আরো সজীব। পাঠ্যপুস্তকের তথ্যভার পরিবেশন, পরীক্ষা-কৃত্যালির নীরস অভ্যাস, বৈচিত্র্যহীন শিখন প্রক্রিয়ার বাইরে এসে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীকে নানা শিখনসম্ভারের মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রকৌশলে ভাষাশিক্ষায় সহায়তা করবেন। সেজন্য প্রতিটি শ্রেণির একটি আলাদা 'শিখন পরামর্শ পুস্তিকা ' (Teachers' Manual)–এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক নির্দেশাবলি থাকবে না। নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বর্ণময়, সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলি আগ্রহসহকারে পড়তে উৎসাহী হয়। প্রতিটি শ্রেণিতেই পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অজস্র শিখন-সম্ভার থাকবে। উপরন্তু, শিক্ষার্থীর পাঠদক্ষতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক-পর্ব থেকেই গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। এই গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিশুকে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

প্রতিটি শ্রেণিতেই পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে তৈরি করা হবে যে মানবিক মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ, চিন্তার স্বাধীন বিকাশ প্রভৃতি সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি শিশুমনে জাগরিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য তথ্যবহন এবং তথ্যবিনিময় নয়। যেকথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীকে ক্রমশ জ্ঞান এবং চিন্তার জগতে স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে সাহায্য করা হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

প্রারম্ভিকস্তরে শিশুকে 'দেখা-শোনা-চেনা-বোঝা' থেকে 'বলা-দেখা-আঁকা-লেখা' স্তরে নিয়ে যেতে হবে। এই স্তরে অক্ষর চেনা-কর্মকৃত্যালি, শারীরচর্চা এবং ছবি আঁকা-গান গাওয়া-ছড়া বলার আনন্দময়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত রাখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়াটি একধরনের সচল সমন্বয়ের মাধ্যমে পাঠদক্ষতা, লিখনদক্ষতা এবং ধারণা বিকাশের অভিমুখে সম্প্রসারিত হবে। উৎপাদনশীল এবং সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ভাষাশিক্ষককে গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, দ্বিতীয়-ভাষা শিখন প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এটি একটি সামন্বয়িক (integrated)পাঠক্রম। পাঠ্যাংশের মানস মানচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে নানা থিম বা ভাবমূল-কে শিক্ষার্থীর সামনে নিয়ে আসা হবে।

লেখা বাহুল্য, এ দুটি শ্রেণিতেই আলাদা 'শিখন পরামর্শ পুস্তিকা ' থাকবে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য।

মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষায় অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য বর্তমান। তাকে সম্মান দিয়ে ক্রমশ মান্য চলিতের দিকে শিক্ষার্থীকে অভিমুখী করে তুলতে হবে।

তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীর অন্তিম কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সারাবছরের শিখন প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতে হবে। নানা পরিচিত-অপরিচিত শব্দ, যুক্তাক্ষর সংবলিত বাক্যের শ্রুতলিপি অভ্যাস করাতে হবে। জ্ঞান ও বোধমূলক প্রশ্নোত্তর নানা উদ্‌ভাবনী প্রক্রিয়ায় অভ্যাস করাতে হবে। এর পাশাপাশি স্বাধীন ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর সামনে খুলে দিতে হবে। শিশুসাহিত্য পাঠে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর তর্কশীল, কল্পনাপ্রবণ, জিজ্ঞাসু মন গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যাংশে মান্য চলিত ভাষায় লেখা অগ্রগণ্য লেখকদের ছড়া, গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধের আকর্ষণীয় সম্ভার রাখতে হবে। এই শ্রেণিগুলি থেকে নিয়মিত হাতের লেখা এবং তার ছবি আঁকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর লিখন সামর্থ্য এইভাবে বাড়বে।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণি

এই শ্রেণিদুটি থেকে শিক্ষার্থীকে ক্রমশ সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটি সহায়ক পাঠ থাকবে। এইভাবে শিক্ষার্থী ক্রমশ একটি পুরো বই পড়ার সামর্থ্য অর্জন করবে। নানা বিষয়ে নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি পড়তে পারবে। দেয়ালপত্রিকা এবং হাতে লেখা পত্রিকা বানাতে উৎসাহী হবে। যতিচিহ্নের সুষ্ঠু প্রয়োগ, দিনলিপি রচনা, বিভিন্ন করণ সংক্রান্ত চিঠি (official letter)লেখার সামর্থ্য অর্জন করবে।

পাঠ্যপুস্তকে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অন্তত একজন ভারতীয় ভাষার লেখক [বাংলা বাদে] এবং অন্তত একজন বিশ্বসাহিত্যের [ভারতীয় ভাষা বাদে] লেখক অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁদের রচনা নির্বাচন এবং অনুবাদের কাজটি পাঠ্যপুস্তক নির্মাতা সমিতি সমাধা করবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধ একদিকে যেমন বিকশিত হবে, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্য এবং দেশের সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কেও বোধ প্রসারিত হবে। সে ভারতীয় এবং বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠবে।

সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি

এই শ্রেণিগুলিতেও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটি করে সহায়ক পুস্তক থাকবে। প্রথম ভাষাচর্চায় তাকে আরো অনেক বইপড়ায় উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, দ্রুত হস্তাক্ষরে যেকোনো বিষয়ে সমালোচনা, স্বাধীন মতামত এবং কল্পনাঋদ্ধ অনুভূতি প্রকাশে সমর্থ করে তুলতে হবে। একদিকে সংবাদপত্র, অন্যদিকে বিশ্বকোষ, অভিধান প্রভৃতি আকরগ্রন্থ ব্যবহারের নৈপুণ্য অর্জন করতে শেখাতে হবে

সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতেও আলাদা করে ব্যাকরণ বই থাকবে না। ব্যাকরণের মৌলিক ধারণাগুলিকে পাঠ্যাংশ বিশ্লেষণের সময় এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নিজেই মূলসূত্রগুলিকে সন্ধান করে প্রয়োগ করতে পারে। পাঠ্যাংশে গদ্য এবং কবিতার পাশাপাশি নাটক রাখতে হবে। নাটক পড়তে এবং অভিনয় করতে উৎসাহ দিতে হবে। নাট্যরূপ দেওয়া, গদ্যরূপ দেওয়া, স্বাধীন রচনা লেখার উৎসাহ দিতে হবে। সবসময় শিক্ষার্থীকে নানা ধরনের সৃষ্টিশীল ভাষাচর্চায় উৎসাহ দিতে হবে।

পাঠ্যাংশে ভারতীয় সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত অংশ থাকবে।

নির্মিতির প্রাথমিক ধারণা যেমন প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, বাক্যরীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে। সেগুলি অভ্যাস করাতে হবে। বানান প্রয়োগ এবং বানান চেতনায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেগুলি অভ্যাস করাতে হবে।

নবম-দশম শ্রেণি

এই শ্রেণিতে আলাদা ব্যাকরণ বই থাকবে। এতদিন যে ধারণাগুলি শিক্ষার্থীকে শেখা-সন্ধান- নির্মাণে ব্যাপৃত রাখা হয়েছিল সেগুলি ক্রমশ প্রথাভুক্ত আকারে পরিবেশন করা হবে।

পাঠ্যপুস্তক এবং পাশাপাশি সহায়ক পাঠ থাকবে। পাশাপাশি নির্মিতিতে নতুন কয়েকটি ক্ষেত্রের উন্মোচন ঘটাতে হবে। অনুবাদ তার মধ্যে প্রথম। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি ভাষাতেই পারস্পরিক অনুবাদচর্চা (তৃতীয় ভাষাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।) শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতাকে মজবুত করবে।

এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে প্রুফ রিডিং, সম্পাদনা, মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয়েও প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে।

প্রথম ভাষাশিক্ষা এবং শিক্ষণ সর্বদাই যেন আনন্দময়, উদ্‌ভাবনী, কল্পনাসমৃদ্ধ এবং নিপুণ অভিব্যক্তিনির্ভর হয়। তথ্যের বদলে সেখানে ভাষার নিজস্ব বিকাশ এবং চর্চার ভিত্তিকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

পাঠক্রম

বিষয় : দ্বিতীয় ভাষা [বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা]

প্রারম্ভিকস্তর থেকে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সেই ভাষায় সাবলীলভাবে কথোপকথন এবং লিখন সামর্থ্য অর্জন করা। প্রথম ভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষাতেও শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। নতুন শিক্ষাক্রম/ পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দুটি ভাষায় দক্ষতা শিক্ষার্থীর ভাষাবোধকে পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে দুটি ভাষাকে সামন্বয়িক (integrated) পদ্ধতিতে শেখানোর কথা ভাবা হয়েছে। সেই সূত্রে গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, স্থানিক ইতিহাস-ভূগোলের প্রসঙ্গও সংযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা শিখন প্রথম ভাষার পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি থেকেই শুরু হবে। 'দেখা-শোনা-চেনা-বোঝা থেকে ক্রমে 'বলা-পড়া-আঁকা-লেখা' স্তরে নিয়ে যেতে হবে । প্রথম দুটি শ্রেণিতে বর্ণমালা চেনা, লিখন ইত্যাদি যেমন চলবে, দুটি ভাষাতেই শারীরশিক্ষা, খেলাধূলা, সৃষ্টিশীল কাজকর্ম সবই নির্দেশ অনুযায়ী সমাধা করতে শেখাতে হবে।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিখনসম্ভার কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন পাঠ্যাংশের মানস মানচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে নতুন ভাবমূল বা চিন্তনগুলিকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে চালাতে হবে। একেবারে বুনিয়াদি স্তর থেকেই

শিক্ষার্থীকে দুটি ভাষাতেই ভাবপ্রকাশে সমর্থ করে তুলতে হবে। শিক্ষকেরাও যেন ভীতিপ্রদ তথ্যভার বিনিময়কেই পাশের একমাত্র পথ বলে না ধরে নেয়।

দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ অভিমুখের কথা মাথায় রাখা হয়েছে।

১) দ্বিতীয় ভাষা শিখন প্রারম্ভিক স্তরে দ্বিভাষিক পদ্ধতিতে হবে। তবে, উচ্চতর শ্রেণির ক্রমপথে তাকে দ্বিতীয় ভাষার সঙ্গে সড়গড় করে তুলতে হবে।

২) বলা এবং লেখায় বিশেষ জোর দিতে হবে।

৩) শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য দ্বিতীয় ভাষার বইপত্র গ্রন্থাগারে রাখতে হবে এবং চতুর্থ শ্রেণি থেকে তাকে ঐসব বই পড়ার উৎসাহ দিতে হবে। পঠন-দক্ষতার ক্ষেত্রেও প্রতিটি শ্রেণির অন্তিমে নির্দিষ্ট সামর্থ্যসীমা তৈরি করতে হবে।

৪) দ্বিতীয় ভাষা প্রথমে শুনে বোঝা, তারপর শুনে-বুঝে মৌলিক প্রশ্নোত্তর এবং সেই ভাষায় মতামত প্রদানের দিকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে।

৫) দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষার্থীর শব্দভান্ডার নানা শিখনসম্ভার এবং ক্রিয়াখেলা নির্ভর পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় ভাষার পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক এই বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী করা আবশ্যিক।

৬) প্রথমে শ্রেণিকক্ষে, পরিবর্তীকালে বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার তথা দ্বিতীয় ভাষায় পারদর্শী তুলতে হবে। তার মূল্যায়ন ও বিশেষ জরুরি। যে-শিক্ষার্থী ন্যূনতম মানে পৌঁছাতে পারবে না, তার ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭) শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় ভাষার চলিতরূপে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। উচ্চপ্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী যেন স্পষ্ট হস্তাক্ষরে যেকোনো বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করার সামর্থ্য অর্জন করে সেদিকেও নজর দিতে হবে। বলাবলি বা কথোপকথনের ক্ষেত্রে পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণিতেই তাকে মোটামুটি সাবলীল করে তুলতে হবে। শিক্ষকরা কোনো বিশেষ শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় ভাষার ক্লাসে বাধ্যতামূলকভাবে সেই ভাষা ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

৮) দ্বিতীয় ভাষার গান, কবিতা, ছড়া যথেষ্ট পরিমাণ অনুশীলন করতে হবে যাতে ভাষার গঠন তথা বৈশিষ্ট্য সহজে শিক্ষার্থীর রপ্ত হয়।

পাশাপাশি মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণ নির্ভরতার বদলে স্বাভাবিক ভাষাব্যবহার এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুশীলনীতে এমন ভাবে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থী নিজেই সেগুলিকে সন্ধান এবং সমাধান করতে পারে। নবম-দশম শ্রেণিতে আলাদাব্যাকরণ বই থাকবে যেটি প্রথম ভাষার ব্যাকরণ বইয়ের তুলনায় হাল্কা হবে। তবে ব্যাকরণের প্রথাভুক্ত ধারণায় (সংজ্ঞা, নীতি, নিয়মক্রম, ভাষাবৈশিষ্ট্য) তাকে ওই দুই শ্রেণিতে অভ্যস্ত করে তোলা হবে। দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষণের পদ্ধতি আনন্দদায়ক, চাপমুক্ত, ব্যবহারিক-অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং সর্বোপরি আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। একথা মাথায় রেখেই পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করতে হবে এবং পাঠ্যাংশ নির্বাচন করতে হবে। ভাষাচর্চা এবং অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সংযুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীকে প্রথম-দ্বিতীয় ভাষার পারস্পরিক অভিধান, সমার্থ শব্দকোষ, আকরগ্রন্থে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। নবম-দশম শ্রেণিতে দ্বিতীয় ভাষায় সাবলীলভাবে মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশ নেওয়া এবং সৃষ্টিশীল রচনায় পারদর্শী করে তুলতে হবে।

Curriculum
Second Language
English

General Objectives:

When a child comes to school for the first time he feelshe is walking into anunknown domain where his voice and experience will never be heard but he will have to listen to the voice of the teacher. The period from infancy to adolescence is one of rapid growth and development. So, "the curriculum must have a holistic approach to learning and development that is able to see the interconnections and transcend divisions between physical and mental development and between individual development and interaction with others" [N.C.F. 2005]

Cognition involves the capacity to make sense of the self and the world, through his actions and language. "Meaningful learning isa generative process of representingand manipulating concrete things and mental representations, rather than storage and retrieval of information. Thinking, language [both verbal and sign], and doing things are thus intimately inter-twined."[NCF2005]

Educationists have observed that the child learns through a variety of activities like, through direct experiences, making and doing things, experimentation, reading, listening,expressing himself in speech, movement or writing-both individually or with others. He requires opportunities of all these kinds in the course of his development.

Learning takes place not only within the class room/school but also outside the school. Needless to say, learning is enriched when these two realms interact with each other and the experiences gathered from these domains are integrated. Art and work provide opportunities for holistic learning that is rich in tacit and aesthetic components. Such experiences are essential for linguistically known things to be learnt through direct experience and integrated into life.

CLASSWISE COMPETENCIES AT A GLANCE

BASIC LEVEL [CLASS I & II]

[Language learning in integrated and comprehensive manner]

Sl.	Competency	Language experience	Class I	Class II
1	Observing and identifying	• identifying objects within the classroom and outside • observing pictures • observing and counting	• identifying common objects of daily use • identifying contents of a picture or diagram • counting objects • identify letters	• identifying common flowers, season, human organs, • small and capital letters [recapitulation] • counting days and months
2	Listening-speaking	• rhymes, lullabies and songs • teacher's instructions • stories/fables • visual art • puzzles	• listen and articulate rhymes and enact with gestures • follow instructions • understand and respond to queries • tell the contents in picture	• integrating health and hygiene through rhymes and pictures • integrationof mathematics with language • listening to stories and answering questions

		• phonics	• solve puzzle • picture-word integration • simple basic phonics	• drawing pictures and discussing on theme • interaction of social science with art and language • articulating di-syllabic and tri-syllabic words
3	Conversation	• playing games • using structures • fun in mathematics • art of questioning	• using psycho-motor activities and articulating words • learning courtesies • using structures of \`I am/I can see' Structures for seeking permissions [May I...] • observing pictures and integrating with words for story making	• count and tell • use of \`this' and \`that' • asking questions [\`What is your name?/who are you'] • story recapitulated through conversation • answering questions of the teacher • use introductory \`it' and \`there'
4	Reading	• English letters • words • sentences • numbers • reading rhymes	• reading letters • reading words [monosyllabic and disyllabic words] • reading words and matching pictures • numbers [1-10]	• reading disyllabic words • reading numbers [1-20] • reading and matching words and figures of English numbers • sentences of 5-6 words • rhymes
5	Writing	• English letters • words • sentences • numbers	• small and capital letters • writing numbers • words of 4-6 letters • words of 3-4 letters	• disyllabic words • numbers [in words and figures] • use small and capital letters • sentences of 3-5 words • use introductory \`it' and \`there'
6	Noticing grammar	• noun, • be-verb, auxiliary verb \`can', regular verb, have/has-verb, • present & past tense, • Wh-word, • introductory	• nouns-material and common nouns • be- verb [am] • can- verb • present form • use of \`may' in question form[\`May I go/']	• nouns • adjectives- knowing colour • be- verb[am/is/are] • past forms[regular verbs] • have/has verb • use of \`this/that • introductory \`it'

		`it' & `there' • using `this'/ `that'		/`there'
7	Developing vocabulary	• common wordsof daily use • English words used in Bengali • action words	• English words also used in Bengali • common English words • words of courtesy/ wish • situational words • action words [from rhymes]	• names of flowers, seasons, organs of the body • words related to nature • days and months • words related to themes

Main Focus Areas in the Primary Level

[Class III –V]

- The focus of language learning should be on developing oral-aural skills rather than on reading and writing skills as language learning is done first with the ear, then with the eye.
- The goal for language acquisition for class III-V should on development of language skills and not on knowledge acquisition.
- Emphasis should be given on phonetic development of the learners.
- Learners should be given good exposure to listening materials through fun-games, rhymes, story-telling, instructions and even songs as the learners are nor used to listening to connected English speech.
- Language acquisition is done more proficiently when it is integrated with the skills of other subjects [like history, geography, mathematics etc.].
- Wide range of activities like visual art, games, fine art, role play, song and dance etc facilitate the child to acquire the skill of language as enjoys learning with fun. He is thus liberated from the phobia of learning English.

Class wise Competencies at glance

[Class III-V]

Sl. no	Competency	Language experience	Class III	Class IV	Class V
1	Observing and Identifying	➢ Identifying Professionals ➢ Observing map ➢ Historical monument ➢ Hill/river ➢ Trees, birds ➢ Mathematical counting ➢ philately	*co-relating L1 and L2 by identifying birds, fish, animals, insects *identifying sounds of animals and birds and mimicking them *developing reasoning skill through mind mapping on science themes *observing objects of nature *counting objects within the classroomand outside *observing the clock to know the time *observing the sun to know the diurnal time	➢ Persons of certain professio n-s ➢ Identifyin g states and capitals ➢ Singular and plural numbers	➢ Collecting pictures of historical personalities and making calendar ➢ Observing historical monuments ➢ Identifying rivers/hills of the district and making models ➢ Observing seasonal flowers and making scrap-book ➢ Colleting stamps and identifying countries
2	Listening and	➢ Rhymes/songs ➢ Stories	*listening and reciting	*Listening to rhymes	*Listening to poems and songs gaining

	speaking	➢ Quiz ➢ Puzzle ➢ Games ➢ Art and craft ➢ Role play	rhymes *listening to stories of value education. Fables and folk tales. Fairy tales *listening to puzzles, stories-integrating with Mathematics *listening and responding to quiz questions and integrating with other subjects *engaging into games, developing grammatical skill and vocabulary *engaging into art and craft, developing skill of listening comprehensio n *developing skill of conversation using Wh-words andintegrating	developing health habit *Listening to stories with moral developing value *Listening to puzzle developing thinking ability *Enacting role play and developing conversational skill *Interacting in quiz, developing oral-aural skill *Integrating geometry with language by making models. listening to interactions	skill of days of different months *Fictions relating to history relating to science integrating language with other subjects *Involving games and integrating with L1 *Developing vocabulary through puzzles *Telling stories and sharing experience with others

			with mathematics		
3	Reading	➢ Biography ➢ Short story ➢ Poems ➢ Short play	*description of animals & birds and developing the skill of using adjectives *reading & enjoying fairy tales, rhymes *reading materials on environment *reading materials for gaining skill to use conjugation of verbs with subject	*Reading stories to get exposure grammatical items *Stories relating to environment making the learner conscious about it *Stories having dramatic element giving them exposure to drama	*Reading stories and gaining experience about past actions *Developing grammatical skill through reading *Reading poems and integrating descriptions with art *Reading biographies and integrating with history
4	Writing	➢ route-guide ➢ personal letter ➢ story ➢ descriptive writing ➢ response to questions	*developing the skill of sequencing *writing meaningful sentences *responding to questions *writing short descriptive paragraph	*Descriptive writing *Writing short paragraph *Response to question	*Developing skill to write route guide *Describing eminent persons *Gaining skill to write letter * Writing short story

5	Noticing grammar and developing vocabulary	➢ number ➢ preposition ➢ gender ➢ verbs ➢ adverbs ➢ adjectives ➢ pronouns ➢ tense ➢ synonyms and antonyms ➢ orthography ➢ punctuation	Using Wh-word question *solve crossword puzzle *noticing subject & predicate *Developing vocabulary through thematic approach *integrating mathematics with language by gaining skill in using adjective indicating size, shape etc	*Use of present continuous tense *Exposure to gender, pronoun, regular& irregular verbs, preposition, adverb *Gaining the skill in spelling *Developing synonyms and antonyms	*Gaining skill to use linkers in paragraphs *Skill to use punctuation marks * Noticing grammatical items like gender, number, possessive pronoun, adverb preposition, past tense in writing story/paragraph

CURRICULUM DESIGN FOR THE UPPER-PRIMARY LEVEL

[Class VI-VIII]

General objectives:

- Developing basic proficiency in language for communicative purposes
- Developing competency in language acquisition
- Developing higher order language skills for meeting the challenges of life

Class wise Competency Analysis

Sl	Competency	Language experience	Class VI	Class VII	Class VIII
1	❖ Listenin	❖ rhymes ❖ musicals ❖ riddle ❖ story ❖ games ❖ following	listening andcomp -ing stories/ poems	*listening to song to gain skill	*listening to environmental sounds by

		directions ❖ listening /viewing skits	*listening to problem *following instructions	in using simple future *listening to stories to guess outcome ❖ following instructions to make models	audio-visuals and recite poems *Listening to story and comprehend *listen and view skit *listen to directions
2	Speaking	❖ reciting ❖ story telling ❖ role-play ❖ conversation ❖ quiz ❖ problem solving ❖ narrating ❖ courteous expressions	*Reciting *Telling a story to peers *Guessing the motif of a mime *Estimating about height *Doing role Play of characters	*Performing elocution *Describing event *Courteous expressions *Exploring solutions *Role play of real situations	*Role play of situations in real life *Telling stories to peers *Elocution *Narrating an event to peers *Picture reading *Ability ask quiz questions
3	Reading	❖ story ❖ poems ❖ comic strip ❖ humorous play ❖ non-fictional ❖ authentic writing	*Developing Skill to Identify Rhyming Words;	*Reading and under standing humorous play, poem,	*Short humorous play/skit reading comics Short stories and comp *Reading poems

			*Comprehend the theme of prose/poem	comic strip,, stories *Gathering information From Biography Experiencing va Values from sto	and enjoying *Reading non Fictional and gathering information
4	Writing	❖ paragraph on themes ❖ encoding /decoding a family tree ❖ short dialogue ❖ preparing ❖ personal folio ❖ letter writing ❖ cartoon making ❖ biography ❖ paraphrasing ❖ story ❖ summary ❖ project writing ❖ composing rhyme	*Use of Apostrophe *Paragraph on Themes Story *Encoding/ Decoding a Family tree *Making a Personal folio *Writing a short conversation	Writing Letters, Cartoon, Paraphrasing, Story, rhyme, Dialogue project	***W**riting stories, Paragraph, poster, Biography, Summary, Autobiography
5	Skill in Grammar	❖ punctuation ❖ comparative forms of adjectives/ adverbs ❖ plural noun ❖ tense ❖ pronoun	*Use of Countable & Uncountable Noun Gender, Present & past	*Comparative Forms, functions of adverbs, plural noun present/	*Modals, and Auxiliary verbs relative clause, narration change, infinitive, voice change, present/

			Continuous Tense Possessive Pronoun Adjective, Adverb for comm purposes	perfect tense, Possessive Pronouns/ Adjectives Modals, Future tense In writing for Semantic Purposes	past perfect continuous tense
6	Developing Vocabulary	*identifying Synonyms, Antonyms, Homonyms, and Gaining skill in using them in meaningful situations	*Developing Vocabulary by maze crossword word- matching	*Synonyms, Antonyms, Homonyms, Rhyming Words, single Word for Group of words	Prefix and suffix

Curriculum
English
(Class IX & X)

The existing curriculum of English [E.S.L.] points out that the main objectives of the study of Second Language are as follows:

1. to enable pupils to attain working knowledge of the language from utilitarian point of view;
2. to develop their capacity to express themselves in the language freely, correctly and with proper pronunciation in talks or conversation on ordinary topics;
3. to enable pupils to express their ideas of non-technical nature in simple correct language;
4. to generate in pupils a love of the language and a desire to cultivate it at leisure for pleasure and profit.

However, the National Curriculum Framework [N.C.F.] 2005 says that the two main goals of the second language curriculum are-

- attainment of basic proficiency
- development of language into an instrument for abstract and knowledge acquisition

This clearly points that integrated approach to the teaching of different skills of language [like listening, speaking, reading, writing etc], including communicative competence, is

extremely important. As the child grows up he requires higher order skills like negotiating, decision-making, inter-personal communication skills etc to cope up with the demands and challenges of everyday life.

This leads us to the framing of curriculum for Upper-Primary and Secondary level. The rationale is as follows:

Rationale:

The English language course encompasses the experience, study, and appreciation of language, literature, media and communication. It involves language processes: speaking, listening, reading, viewing, writing, and other ways of representing. At this level the use of English language to think, learn and communicate effectively in a wide variety of communication situation is given central importance.

Aims and Objectives:

- to understand the functions of language, in general
- to understand the basic features of the English language
- to understand the purposes of language as an instrument for social interaction
- to develop the listening and speaking skills of the learners in order to help them interact effectively at different situations
- to develop their interest in reading and their ability to interpret a variety of written text materials
- to develop their ability to write for a variety of purposes
- to know and use figurative language effectively for language competence
- to develop mastery on the use of correct grammatical structures and pronunciations
- to acquire sufficient vocabulary and language structure practice
- to develop confidence and competence of the learners through the use of a range of media and computer technologies.

Learning Experiences:

In the course of studying English as Second Language the learners will pass through the following learning experiences:

- practice the language skills developed earlier in the Primary level to enhance their ability to speak with proper pronunciation, stress and pause, to listen carefully to understand what others are saying and to respond appropriately
- engage in activities and discussions in which they practice language in formal and informal situations
- practice English sounds for pronunciation and intonation
- explore the relationship between language and grammar
- learn the English language protocols used in greeting, welcoming, expressing sympathy etc
- participate in regular programmes to enhance their ability and interest in reading
- reading extensively from varied sources including text materials that are

Personal [e.g. personal letters of eminent persons, autobiography, diary, etc.]
Transactional [e.g. report, description, biography, information etc.] and

Poetic[e.g. plays skits, short stories, poems, rhymes etc.]

- interact with a variety of reading materials which require different kinds and levels of interpretation
- glean information available in mass media and use it in their day to day communication
- write extensively for various purposes such as personal, transactional and poetic writing
- develop the language competence of the learners through exercises such as note-taking, summarizing and paraphrasing to enhance their study skills

Learning Outcome

It is expected that by the end of the school level of learning experiences the learners will be able to achieve the following goals:

1. **Knowledg**e [acquisition and recall]
    - ability to classify
    - discriminate between real [or tangible] and make-believe[or unreal]
    - discriminate between fact and opinion
    - ability to outline and summarize
2. **Comprehension**[understanding ,and interpreting]
    - ability to compare and contrast
    - identifying main idea
    - ability to compare word meaning
3. **Application**
    - estimating
    - anticipating probabilities
    - inferring
4. **Analysis**
    - judging completeness
    - judging relevance of information
    - logic of actions
    - recognizing fallacies
5. **Synthesis**
    - planning projects
    - building hypothesis
    - proposing alternatives
6. **Evaluation[** review, critically examined conclusions and judgements]
    - making decision
    - judging accuracy
    - identifying values

পাঠক্রম
তৃতীয় ভাষা
ষষ্ঠ শ্রেণি

ষষ্ঠ শ্রেণি শেষে/ প্রান্তিক সামর্থ্য

দেখা শোনা বোঝা বলা

- সংবাদমাধ্যমে খবর শোনা। গান, থিয়েটার, সিনেমা দেখা। এগুলি অভ্যাস করা। বোঝা।
- প্রাত্যহিক ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী এবং অভিজ্ঞতার ভাষান্তর শোনা-বলা-বোঝা।
- শব্দ-বাক্য শুনে তার ছবি আঁকা।
- ধীরে ধীরে বাক্য বলা। ছোটো-ছোটো কথোপকথনে অভ্যস্ত হওয়া।
- বাক্য শুনে প্রথম ভাষায় মুখে মুখে অনুবাদ করা।

পড়া

- অক্ষর এবং শব্দ চিনতে পারা। প্রথম ভাষার সাপেক্ষে চেনাচেনি।
- ছোট বাক্য পড়তে পারা।
- ঐ ভাষার ২০০টি শব্দ পড়তে পারা।

লেখা

- বর্ণমালা লিখতে পারা।
- ৩০টি শব্দ লিখতে পারা।
- সমান ছাঁদে ৩০টি শব্দ হাতের লেখায় অভ্যাস করা।

সৃজনক্রিয়া ও শিল্প কর্মকান্ড

- নির্দেশ অনুযায়ী বুঝে সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে সক্রিয় অংশ নেওয়া।
- শরীর চর্চা/ খেলাধূলায় তৃতীয় ভাষায় নির্দেশ পালন।

সপ্তম শ্রেণি (প্রান্তিক সামর্থ্য)

দেখা শোনা বোঝা বলা

- তৃতীয় ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বলতে পারা।
- বিভিন্ন থিয়েটার, সিনেমা দেখা। গান, কবিতা শোনা। তার কাহিনিমূল বলতে পারা।
- কাহিনি থেকে তার চিত্রায়ণ। ছবি দেখে তার কল্পনা অনুযায়ী কাহিনি বলতে পারা।
- প্রথম ভাষার সঙ্গে পারস্পরিক অনুবাদ সাবলীলভাবে বলতে পারা।

পড়া

- ছোটো-ছোটোকাহিনি পড়তে পারা। পাঠ্যবই থাকবে। বই থেকে পাঠ্যাংশের মানস-মানচিত্রের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় পড়তে পারা।
- সংবাদপত্র (সেই ভাষায় থাকলে) পড়তে পারা।
- পড়তে পড়তে তৃতীয় ভাষায় ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে নিয়ে বুঝতে পারা।

সেগুলি অভ্যাস করা । প্রথম ভাষার সাপেক্ষে বুঝতে হবে। বিশেষ্য, বিশেষণ, বচন, ক্রিয়া, কাল প্রভৃতি ।

লেখা

- পাঠ্যাংশের সারসংক্ষেপ লিখতে পারা।
- নানা অনুশীলনী
  - ঠিক শব্দে বা শূন্যস্থান পূরণ।
  - সমার্থক শব্দতালিকা নির্মাণ।
  - শব্দ/ বাক্য মেলানো।
- নিয়মিত হাতের লেখা অভ্যাস করা এবং তার ছবি আঁকা।

সৃষ্টিশীল কৃত্যালি

- নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পকর্ম করতে পারা।
- নির্দেশ অনুযায়ী ছবি আঁকা, হাতের কাজ করা।
- খেলাধূলায় তৃতীয় ভাষার ব্যবহার সাবলীল ভাবে করতে পারা।

অষ্টম শ্রেণি

অষ্টম শ্রেণি শেষে/ প্রান্তিক সামর্থ্য

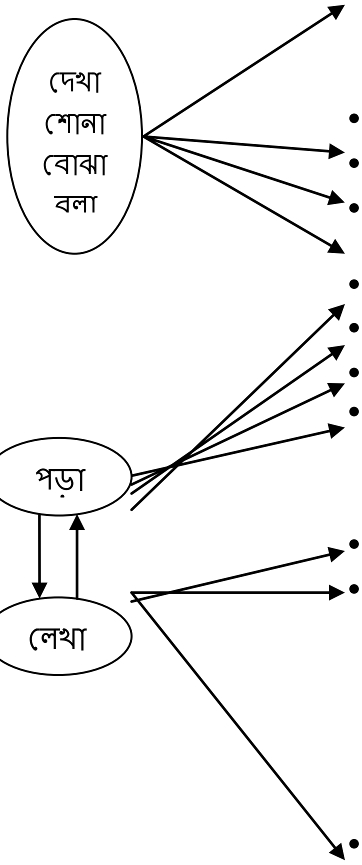

- শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক কথোপকথনে সক্ষম হওয়া। নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র বিষয়ে কথা বলা তথা মতামত প্রকাশ করার সামর্থ্য অর্জন।
- মুখে মুখে প্রথম ভাষার সঙ্গে পারস্পরিক অনুবাদ।
- সেই ভাষায় গান, কবিতা উপস্থাপন।
- নানা উৎসব, পার্বণ, ঘটনার বিবরণ মুখে মুখে দেয়া।

- ব্যাকরণের জটিল দিকগুলি ক্রমশ বুঝে তার সূত্র নির্মাণ
- পাঠাংশ পড়ে মানে বোঝা। পাঠ্যবই থাকবে।
- নিয়মিত সংবাদপত্র অনুশীলনমূলক ভাবে পড়া।
- নানা অনুশীলনের মাধ্যমে বাক্যরীতি, ভাষারীতি, যতিচিহ্ন, বানান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। প্রথম ভাষার সঙ্গে সংযোগ রেখে একাজ করতে হবে। ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য নিজে তৈরি করা।
- ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তর লিখন সামর্থ্য।
- ভাষা ব্যবহার করে ভাবপ্রকাশ। অনুশীলনীর মাধ্যমে নিয়মিত অভ্যাস করা। বাক্য বাড়াও ।
  - রচনা/ সমালোচনা/ দিনলিপি লেখা।
  - ভাষাকেন্দ্রিক লিখিত খেলা/ যেমন-বাক্যটি বিপরীত করো। বাক্যটি সদর্থক/ নঞর্থক করো
- সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে কাহিনি নির্মাণ।

সৃষ্টিশীল কৃত্যালি

- চিত্র নির্মাণ → কাহিনির / ইতিহাসের
- হাতের কাজে ঐ ভাষাভাষীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা।
- ঐ ভাষা নানা খেলা তৈরি করে ঐ ভাষাতেই সমবেত অভ্যাস।

নবম-দশম শ্রেণি

<u>প্রান্তিক সামর্থ্য</u>

দেখা শোনা বোঝা বলা

- নিয়মিত তৃতীয় ভাষায় সংবাদ/ সাক্ষাৎকার/ অনুষ্ঠান/ আলোচনা শোনা এবং বলা।
- প্রাত্যহিক জীবনে তৃতীয় ভাষার ব্যবহার নিয়মিত ভাবে করা।
- কোনো একটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাষায় বলতে পারার সামর্থ্য। খেলার ধারাভাষ্য দেবার সামর্থ্য।
- কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে(৫+৫) বলতে পারার সামর্থ্য।
- গান, কবিতা গাইতে-বলতে পারার সামর্থ্য ৯(৩+৩) অর্জন।

প

লে

- পাঠ্যাংশ সাবলীল ভাবে পড়তে পারা। প্রথম ভাষার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে সমার্থশব্দকোষ, অভিধান ব্যবহার করার সামর্থ্য।
- সংবাদপত্র, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, প্রাচীরপত্র সাবলীলভাবে বুঝে পড়তে পারার সামর্থ্য।
- তৃতীয় ভাষার চিঠিপত্র, বই পড়ে সামর্থ্য।
- তৃতীয় ভাষার ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।
- প্রথম ভাষার সঙ্গে পারস্পরিক অনুবাদ লিখনের দক্ষতা।
- প্রষাসনিক চিঠিপত্র, নির্দেশাবলি, বিজ্ঞাপন লিখতে পারার দক্ষতা।ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে পারার দক্ষতা।
- রচনা/ অনুচ্ছেদ লিখতে পারার সামর্থ্য অর্জন।

সৃষ্টিশীল কৃত্যালি

- নির্দেশ অনুযায়ী শিল্পকর্মে অংশ নিতে পারার সামর্থ্য।
- নির্দেশ অনুযায়ী ছবি আঁকা হাতের কাজ করা।
- খেলাধূলা/ শরীরচর্চায় তৃতীয়ভাষার ব্যবহার সামর্থ্য।

পাঠক্রম
গণিত

ক) গণিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে **বেশি সক্ষম** করে তোলা যাতে সে কোনটা ঠিক ও কোনটা ভুল (বা কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা) সে বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে চিন্তা করতে পারে ।

খ) তার **ব্যবহৃত ভাষায়** নানা ধরনের সংখ্যা, আকার ও চিত্র, তাৎপর্যপূর্ণ সাংকেতিক চিহ্ন এবং এগুলোর মধ্যে সম্পর্কের সমন্বয় ঘটাতে হবে । এর ফলে শিক্ষার্থীরা আরো নিঁখুতভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং সেই চিন্তা সংক্ষিপ্ত গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে । এভাবে ছোট ছোট যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে তারা নতুন নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছে আনন্দ পাবে ও শিখতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে ।

গ) গণিতের এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর অন্য বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে এবং বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । প্রথম ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য যে সব বিষয় শেখা হয় (প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি) সেগুলির সঙ্গেও গণিত শিক্ষাসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার । না হলে শিশু গণিত শিক্ষার আকর্ষণ হারাবে। আমাদের এতদিনের গণিত শিক্ষায়, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়নি। সাধারণ ভাবে মনে করা হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে কিছু সংখ্যা এবং সেগুলো নিয়ে পাটিগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ- এই চারটি প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হওয়াই প্রাথমিক পর্যায়ে গণিতের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষকও এই প্রক্রিয়াগুলিকে যান্ত্রিকভাবে শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে নির্ভুল ভাবে কষতে সাহায্য করেন । তার ফলে শিক্ষার্থীর স্মৃতিনির্ভরতা বেড়ে যায়। ধরে নেওয়া হয় যে, তার **যুক্তিবোধ ও চিন্তাশক্তি পরবর্তী সময়ে বেড়ে যাবে ।** ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গণিতের ভিতর দিয়ে যুক্তি নির্মাণ ও চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়না। তারা গণিত বিষয়টিকে ভয় পেতে শুরু করে এবং কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করতে পারেনা ।

ঘ) শিখন চলাকালীন শিশু গণিতে ভুল করবেই এটা ধরে নিতে হবে । শিশুর যে ভুল করারও অধিকার আছে তা স্বীকার করে নিয়ে গণিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্মাণ করতে হবে । শিশুরা যাতে নিজেরাই নিজেদের গণিতে ভুল শুধরে নিতে পারে তার জন্য পাঠ্যপুস্তকে এবং পঠন-পাঠন প্রক্রিয়াতে শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিসর(Space) রাখতে হবে। যাতে শিশু লজ্জা ও ভয় না পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে । অন্যদিকে তার চিন্তন প্রক্রিয়ায় এবং যুক্তি প্রয়োগের প্রতি ধাপ বিচার করে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে ।

এই প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে **গণিত পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** স্থির করতে হবে । সাধারণভাবে এই **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** নিম্নরূপ হতে পারেঃ

- শিশুর মনে যাতে **গণিত-ভীতি গড়ে না ওঠে** সে বিষয়ে বিশেষভাবে সচেষ্ট থেকে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি ও তার ব্যবহার করতে হবে ।

- ❖ শিশুর মাতৃভাষা (বা প্রথম ভাষা) ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে **সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে** গণিত শিক্ষা শুরু করতে হবে। (শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষায় যেসব ভাষা আসেনি তা প্রাথমিক স্তরের গণিতে ব্যবহার না করাই ভালো।)
- ❖ গণিত শিক্ষায় শিশুর **স্মৃতিশক্তিকে যথাসম্ভব কম** কাজে লাগাতে হবে। সংখ্যা গণনার প্রথম ধাপ থেকে **বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে এবং নানা সক্রিয় শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে** শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে যুক্তিপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক করতে হবে। শিশু প্রথমে যাতে বুঝতে না পারে সে কোনো একটা বিষয় শিখছে। এইভাবে আনন্দপূর্ণ মজাদার কৃত্যালির মধ্য দিয়ে সে জানা থেকে অজানা একটা বিষয় জানতে পারবে।
- ❖ শিশুরা দলগতভাবে নিজেদের কাজ করে প্রদত্ত সমস্যাটি নিজেদের মত করে বুঝবে, সম্ভাব্য সমাধানের পথ অনুমান করবে এবং শেষে লক্ষ্যটি আবিষ্কার করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তি-বিচারবোধ কাজে লাগাবে এবং সমজাতীয় সমস্যা সমাধানের নিয়ম নির্মাণ করতে পারবে।
- ❖ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন **ভুল তাদের শেখার পথের স্বাভাবিক অংশ-** গণিত শেখায় এবিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শিশুদের ভুল দেখে তার চিন্তাপদ্ধতির ত্রুটি কোথায় তা বুঝে নিতে হবে ও সেই ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করতে হবে। (প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, গণিতের অতি সাধারণ বিষয়েও নানা ধরনের নতুন পদ্ধতির কথা আমরা আগে ভাবিনি এমন হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীর নতুন চিন্তা ভুল কিনা তা আগে বুঝে নিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং গণিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেই হবে যে 'শিক্ষা উভমুখী')
- ❖ শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে গণিতের গল্প বলা, শোনা ও বলাবলির মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণা-সংকেত থেকে গাণিতিক জ্ঞান ও গাণিতিক সমস্যা তৈরি করতে শেখে- এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।
- ❖ শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত সংখ্যা, ছবি, শব্দ, বাক্য, চিহ্ন —সব কিছুতেই তার সক্রিয় কাজের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ও দলগতভাবে অনুসন্ধান করতে পারবে। এছাড়া এর মাধ্যমে পুরনো পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন পদ্ধতিতে কাজ করার পথ খুঁজে পাবেন।
- ❖ গণিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার্থীর চাহিদামত শিখনপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় ও সহজে হাতের কাছে পাওয়া উপাদান কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ক বোধগঠনে সাহায্য করতে হবে।
- ❖ যে সব বিষয়ে সত্যি সত্যি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের সমস্যা সেগুলোই বাস্তব সমস্যার আলোচনায় আসবে।
- ❖ সত্যিকারের বাস্তব সমস্যা ছাড়া তাদের কাছে মজার এবং তাদের কল্পনাশক্তি বিকাশে সহায়ক সমস্যা থাকবে। বয়সোপযোগিতার বিষয়টা বিশেষভাবে খেয়াল রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

পাঠক্রম কার্যকর করার সাধারণ পদ্ধতির কিছু রূপরেখা

- ❖ গণিত বইতে যথাসম্ভব সহজ ভাষা ও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ভাষা, ছবি বা রেখা এবং গণিতের ভাষা (চিহ্ন) ব্যবহার করে সংক্ষিপ্তও সহজবোধ্য নির্দেশ দিতে হবে। বইতে ব্যবহৃত ছবি যেন জীবনকেন্দ্রিকতা ও গাণিতিক তাৎপর্য দুইই স্পষ্ট করে তুলতে পারে তা দেখতে হবে।
- ❖ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণিতের পরিভাষা এবং তার সংজ্ঞার উপর জোর দেওয়া যাবেনা। উদাহরণ নিয়ে আলোচনা, সক্রিয় কাজ করতে করতেই শিশুকে তা শিখে নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিভিন্ন বিষয়ের ধারণাগঠনের জন্য কার্যকরভাবে মানসাঙ্কের চর্চা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই না কষে অঙ্কের উত্তর বলা বা লেখার অনুশীলনী থাকবে। কোনো ক্ষেত্রে সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা দরকার হলে তা

নিতে পরবর্তী সময়ে উদ্যোগ নিতে হবে । সেক্ষেত্রেও অঙ্কের মত মুখস্থ না করে শিশুরা নিজেরা ঐ সংজ্ঞানির্মাণ করতে পারে কিনা তা দেখতে হবে ।

- ❖ বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও যুক্তি গঠন করার পর্বে ছোট ছোট সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে । উদাহরণ ও অনুশীলনীতেও ছোট ছোট সংখ্যা ব্যবহার করে ধারনা ও যুক্তিগঠন সহজ করে তুলতে হবে ।
- ❖ শিক্ষা বিষয়ক মূল্যায়নে সাধারণভাবে ছোট ছোট সংখ্যা ব্যবহার করে গড়ে তোলা গাণিতিক সমস্যাই থাকবে । (শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ সহায়িকা থাকবে। ঐ শিক্ষণ সহায়িকাতে শিক্ষার্থীর বইয়ের সবকিছু থাকবে ও কীভাবে সক্রিয় কাজ করে ও ছবি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা যাবে সে বিষয়ে সংকেত থাকবে। এছাড়া তুলনায় কিছুটা কঠিন গাণিতিক অনুশীলনের সংকেতও থাকবে । প্রয়োজন বোধ করলে তবেই তাঁরা অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কিছুটা বড় সংখ্যা দিয়ে তৈরি করে দেবেন।)
- ❖ বড় বড় সংখ্যার শিক্ষা মূলত সংখ্যা পরিচিতির জন্যই আসবে । সংখ্যা গঠনের মূল যুক্তি বুঝতে পারলে অতি সামান্য সাহায্য পেলেই শিক্ষার্থীরা বড় বড় সংখ্যা বলতে ও লিখতে পারবে । আবার সংখ্যা গঠনের মূল যুক্তি না বুঝে মুখস্থ করতে বাধ্য হলে তারা গণিতভীতির শিকার হবে ।
- ❖ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আলাদা গণিতের পুস্তক থাকবে না । ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাণিতিক ভাষা ও সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার শিখে নেবে শিশুর আশেপাশের পরিবেশ থেকে ।
- ❖ শিশুকে বাস্তব সমস্যা থেকে আধাবাস্তব এবং শেষে অধিবাস্তব ধারণায় নিয়ে যেতে হবে।
- ❖ গল্প, ম্যাজিক, ধাঁধাঁ চর্চা দিয়ে শিশুকে আকৃষ্ট করতে হবে ।
- ❖ মানসাঙ্কেরচর্চা করতে শিশুকে মনে মনে গাণিতিক সমস্যার চিত্র অঙ্কনে সাহায্য করতে হবে ।

পাঠক্রম

পরিবেশ পরিচিতি

প্রাথমিক স্তর – পরিবেশের জড় ও সজীব উপাদানের বৈচিত্র্য শিশুর চোখে আলাদা আলাদা ভাবে ধরা পড়ে।কখনো কখনো শিশু তার জীবনের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান গুলিকে(দেহগঠন,খাদ্য, পোষাক,বাসস্থান,পরিবার ও সম্পদ) সঠিকভাবে চিনে নিতে ব্যর্থ হয়।এই উপাদানগুলির উপকরণগুলি তার সমাজ জীবন গঠনেও ব্যবহৃত হয়।অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যেই একাধারে নিহিত আছে শিশুর অনুসন্ধিৎসা, জীবন জিজ্ঞাসা আর একদিকে যৌথজীবন গঠনের প্রেরণা। UNESCO এর রিপোর্ট অনুসারে শিখনের চারটি উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে।যথা-(১)জানতে শেখা(Learning to Know)(২)কাজ করতে শেখা(Learning to do)(৩)একসঙ্গে বাঁচার শেখা(Learning to live together)ও (৪)মানুষ হতে শেখা(Learning to be)।পরিবেশে পাঠ্যসূচীতে যে পাঠ গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হলো :

- শিশুকে জিজ্ঞাসু করে তোলা।
- সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ করে তোলা।
- পরিবেশের প্রাকৃতিক নিয়ম,শৃংখলাকে বুঝতে পারা।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে গঠনগত সামঞ্জস্য চিহ্নিত করতে সামর্থ্য গঠন করা।
- কোনো সমস্যার সমাধানের একাধিক বিকল্প পথ আগাম অনুমান করতে সমর্থ করে তোলা।
- প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চক্রাকার পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে পারা।
- দলগত ভাবে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।

শিশুর মধ্যে উপরোক্ত ধারণাগুলি জন্ম নেবে তার পারিপার্শ্বিক ভৌগলিক পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে পুরনো দিনের সভ্যতার বিকাশের ধারার প্রেক্ষিতে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে।শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যই প্রতিষ্ঠা নয়।জীবন থেকে ভয় ও দ্বন্দ্ব দূর করতে,সংস্কারমুক্ত মন গঠন করতে পরিবেশের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বগুলি তাকে সাহায্য করবে।হাতেনাতে কাজ করে এবং প্রমাণের মাধ্যমে নিজে উপলব্ধি করে এই সত্যে পৌছতে চেষ্টা করবে শিশু নিজেই।দলগত শিখণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক ভাবে এই প্রচেষ্টা আরও ফলপ্রসু হবে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তর : পরিবেশের উপাদানগুলির সমাজ নির্মাণে ভূমিকা নির্দিষ্ট হওয়ার পর শিশুর অনুসন্ধিৎসা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়।শিশু পরিচিত অভিজ্ঞতার পিছনে নিহিত বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে জানতে সচেষ্ট হয়।নিজহাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সমীক্ষার মাধ্যমে তার চোখের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে।সক্রিয়তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হল বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভের মূল ভিত্তি।তাই বিজ্ঞানকে জড় বা জীবের ধর্ম আলাদাভাবে আলোচনা করার মত প্রকোষ্ঠকরণ না করে সুসংহত ধারণার জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমন্বিত করা হয়েছে।শিশুকে 'জানা' থেকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা চেনা জগতের উপাদানগুলিকে(সবুজ,উদ্ভিদ,প্রাণি,মূল,কান্ড,পাতা ফুল) শনাক্ত করে তার উৎপাদনমূলক সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।জড় উপাদান গুলির সুসংহত রুপই যে জীবনের সূচনা করে এই সত্যকে বিভিন্ন

পাঠের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ইতিহাস,পরিবেশ ভেদে উৎপাদনের বৈচিত্র্য, উৎপাদনের ক্ষেত্র,ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।সমকালীন সাহিত্য,রচনা,মানবকীর্তি বা বিপর্যয়ের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই সমন্বয়ী ধারণার ভিত্তি সম্পদ আহরণ,খাদ্য সংশ্লেষ, জীবদেহ গহণ,রোগ ও রোগ প্রতিরোধ এর সঙ্গে জড় পদার্থের রুপ ও ক্রমের পরিবর্তন,জটিলতা বৃদ্ধি,বিভিন্ন ধর্মের প্রয়োগের বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে।ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে সমন্বয়ী চেতনা যা সম্পদের সহনশীল ব্যবহার ও সংরক্ষণের ন্যায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনাকে জাগ্রত করে।উৎপাদন ও সহনশীল উন্নতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের জন্ম এই সমন্বয়ী বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির মাধ্যমে গড়ে উঠবে।এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কখনই একা একা শিখবে না।দলগত আলোচনা ও কার্যপদ্ধতি,তথ্য সংগ্রহ,বিশ্লেষণ ও সুসংহতকরণ এবং তার যথার্থতা নিরুপণ করার মাধ্যমে এই বিজ্ঞান শিখনের পথ নির্ধারিত হবে।

পাঠক্রম

পরিবেশ ও জীবনবিজ্ঞান (নবম ও দশম শ্রেণি)

‘পরিবেশ ও জীববিজ্ঞান’ পাঠক্রমে খাদ্যকে কেন্দ্র রেখে উপকেন্দ্রিকভাবে বৃহত্তর ব্যাসার্ধে খাদ্যের সংশ্লেষ ব্যবহার ও পরিণতি সম্পর্কিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে উপ-স্থাপন করা হয়েছে। খাদ্যের ভাঙনের ফলে দেহে সংশ্লেষ হয় নানা গুরুত্বপূর্ণ সমন্বায়কের মাধ্যমে যারা কোনো জীবদেহের (বিশেষত মানুষের) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক অক্ষ গঠন করে। এই সমন্বয়কের ক্রিয়ায় খাদ্য উপাদান কোশীয় বস্তুতে পরিণত হয়। কোশীয় উপাদানের সংশ্লেষ যখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় তখন কোশ বিভাজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং অধিক কোশ কলা বা অঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীবের বিভেদন ঘটালে জননকোশ উৎপন্ন হয় এবং এই জনন কোশের মাধ্যমেই বংশগত বৈশিষ্ট্যের স্থানান্তরণ ঘটে। উৎপন্ন জীব পরিবর্তিত পরিবেশ মানিয়ে চলার জন্য নানাবিধ পরিবর্তন ঘটায়। উৎপন্ন জীব পরিবর্তন যখন তাকে পূর্ববর্তী জীব থেকে পৃথক করে তখনই ঘটে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি। একাধিক প্রজাতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় জীববৈচিত্র্য। জীবজগতের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জড় উপাদানের মিথ :ক্রিয়ায় অনুকূল বসবাসরীতি গড়ে উঠে। আবার মানুষেরই অবিবেচক কার্যাবলীর ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। উপাদানগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে ক্ষতিকারক ও সুযোগ সন্ধানী অনুজীবরা সক্রিয় হয় ও মানবদেহে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে শুধুমাত্র পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য সংক্রামক রোগই ঘটছে না, সৃষ্টি হচ্ছে মানসিক চাপ ও তদ্বজনিত নানাপ্রকার জীবনচর্চাজনিত ব্যাধি। জীববৈচিত্র্যের সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ঘটতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিস্তৃত হতে পারে কাজের ক্ষেত্র। বর্তমান পাঠক্রমে (নবম-দশম) এই ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র যেখানে আত্ম উপলব্ধি, আত্মসচেতনতা,

সমমর্মিতা, কার্যকারিতা ও পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, সৃজনমূলক চিন্তা, সমস্যা চেনা ও সমাধানের ক্ষমতা প্রভৃতি জীবনদক্ষতা অর্জন করে শিক্ষার্থী রূপান্তরিত হতে পারে এক সমাজ সচেতন নাগরিকে। এই নাগরিকই 'সহনশীল উন্নতির' বিমূর্ত ধারণাকে বহন করবে।

পাঠক্রমের বর্তমান কার্যক্রমে জড়বিজ্ঞানের শক্তি, তরলবস্তুর প্রবাহ, জড় বস্তুর ক্রমান্বয়িক রূপান্তর প্রভৃতি ধারণাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। অণুর সৃষ্টি ও তার ক্রমপরিবর্তন, আন্ত :আণবিক ও অন্ত:আণবিক রূপান্তর, অনুঘটক ক্রিয়া, সংবন্ধন ও বিশ্লেষণ এর ন্যায় রসায়ন জগতের উপাদানেরও প্রবেশ ঘটেছে। পৃথিবীর ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির ও ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিফলিত হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের বিস্তারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ বিভিন্ন সময়ে ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন কীভাবে পৃথিবীর জীবমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তারও আলোচনা সূত্র বর্তমান পাঠসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অন্তর্ভূক্ত হয়েছে জনস্বাস্থ্য, একক জীব থেকে জীবমণ্ডলে রূপান্তরের ধারণা, আনবিক স্তরে জীবদেহ গঠনের মৌলিক ধারণা।

Learning steps:

অণু থেকে পরিবেশ উত্তরণ (From Molecule to environment)

a) অণুর সংশ্লেষ পরিবর্ধন ও পরিবর্তন (Synthesis, Elongation and Transformation of molecule)
b) অণুর থেকে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সূচনা (Initiation of Physiological processes by gradual conversion and re-synthesis of old and new molecule)
c) শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ (Control and Co-ordination of Physiological processes)
d) জীবদেহের বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রাক্ পরিবর্তন ও নতুন জীবের উৎপত্তি (Change of characters of organism and origin of new species)
e) বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক মিথো :ক্রিয়া ও জীবমণ্ডল গঠন (Mutual Interaction in between different organism and formation of Biosphere)
f) জীবমণ্ডল, পরিবেশের সুরক্ষা ও সহনশীল উন্নতি (Biosphere, Environmental protection and Sustainable Development)

শিখন প্রক্রিয়াসমূহ (Learning Strategies) :

1) Observation, Data collection and Documentation (পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ)
2) Data Verification, Experimentation (তথ্যাদির, সত্যতা যাচাই, তথ্যাদির দ্বপক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা)
3) Discovery learning (আবিষ্কার মূলক শিখন)
4) Brain storming (মস্তিষ্ক আলোড়ন মূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো)
5) Cognitive and Social Construction of knowledge (বৌদ্ধিক ও সামাজিক জ্ঞান নির্মাণ)

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ:

1) হাতে কলমে কাজ করা ও সমস্যা তৈরি করা
2) একই সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান করা (পূর্বজ্ঞান ব্যবহার ও নতুন জ্ঞান খোঁজা) [প্রজেক্ট তৈরির ভিত্তিতে]
3) প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মুখোমুখি হওয়া, তথ্যাদির সত্যসত্য বিচার
4) অর্জিত জ্ঞানের শিক্ষার্থী ভেদে নানাবিধ প্রকাশ (দলগত শিখন)

নবম শ্রেণি

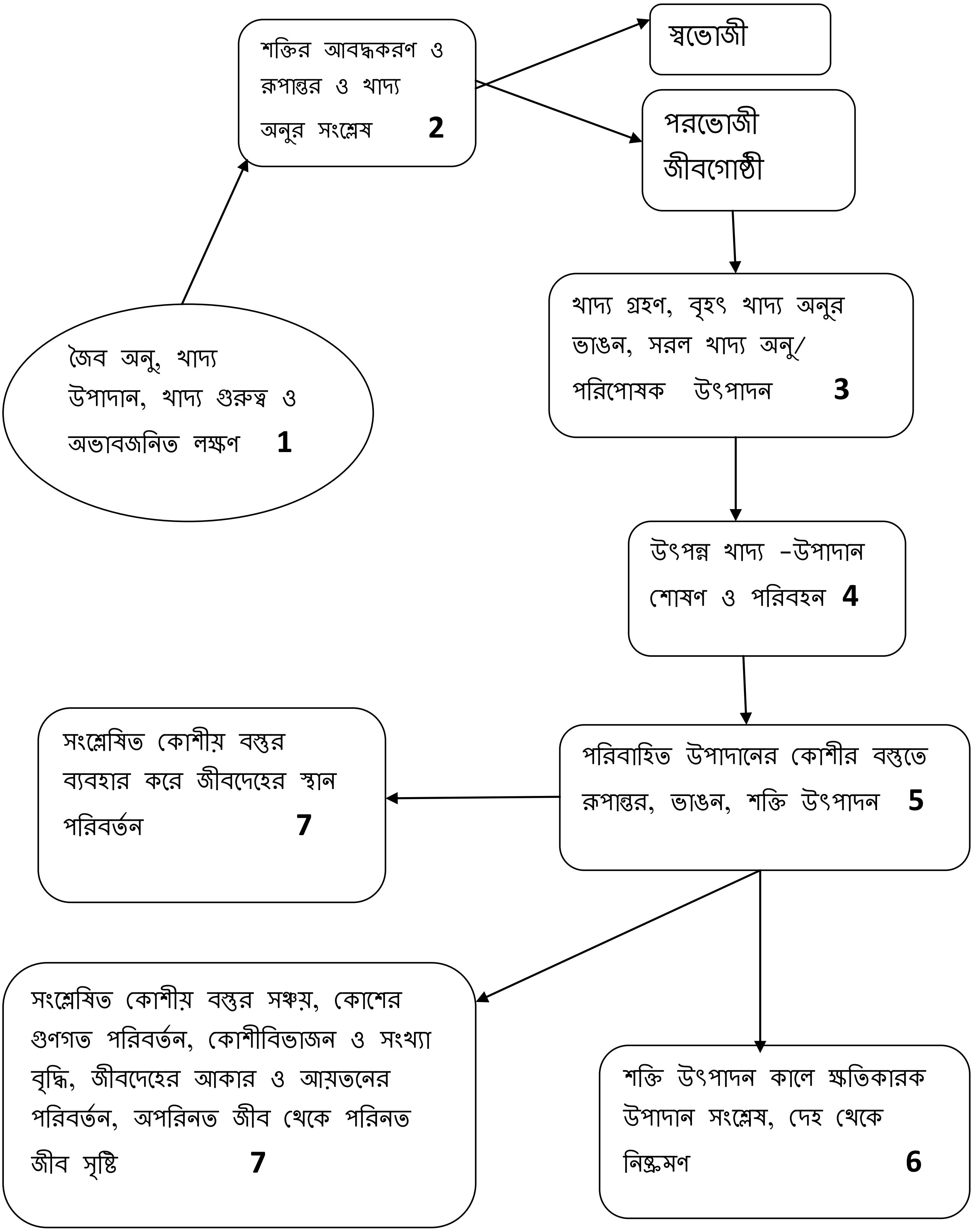
স্বভোজী
শক্তির আবদ্ধকরণ ও রূপান্তর ও খাদ্য অনুর সংশ্লেষ 2
পরভোজী জীবগোষ্ঠী
জৈব অনু, খাদ্য উপাদান, খাদ্য গুরুত্ব ও অভাবজনিত লক্ষণ 1
খাদ্য গ্রহণ, বৃহৎ খাদ্য অনুর ভাঙন, সরল খাদ্য অনু/ পরিপোষক উৎপাদন 3
উৎপন্ন খাদ্য -উপাদান শোষণ ও পরিবহন 4
সংশ্লেষিত কোশীয় বস্তুর ব্যবহার করে জীবদেহের স্থান পরিবর্তন 7
পরিবাহিত উপাদানের কোশীর বস্তুতে রূপান্তর, ভাঙন, শক্তি উৎপাদন 5
সংশ্লেষিত কোশীয় বস্তুর সঞ্চয়, কোশের গুণগত পরিবর্তন, কোশীবিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবদেহের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন, অপরিনত জীব থেকে পরিনত জীব সৃষ্টি 7
শক্তি উৎপাদন কালে ক্ষতিকারক উপাদান সংশ্লেষ, দেহ থেকে নিষ্ক্রমণ 6

দশম শ্রেণি

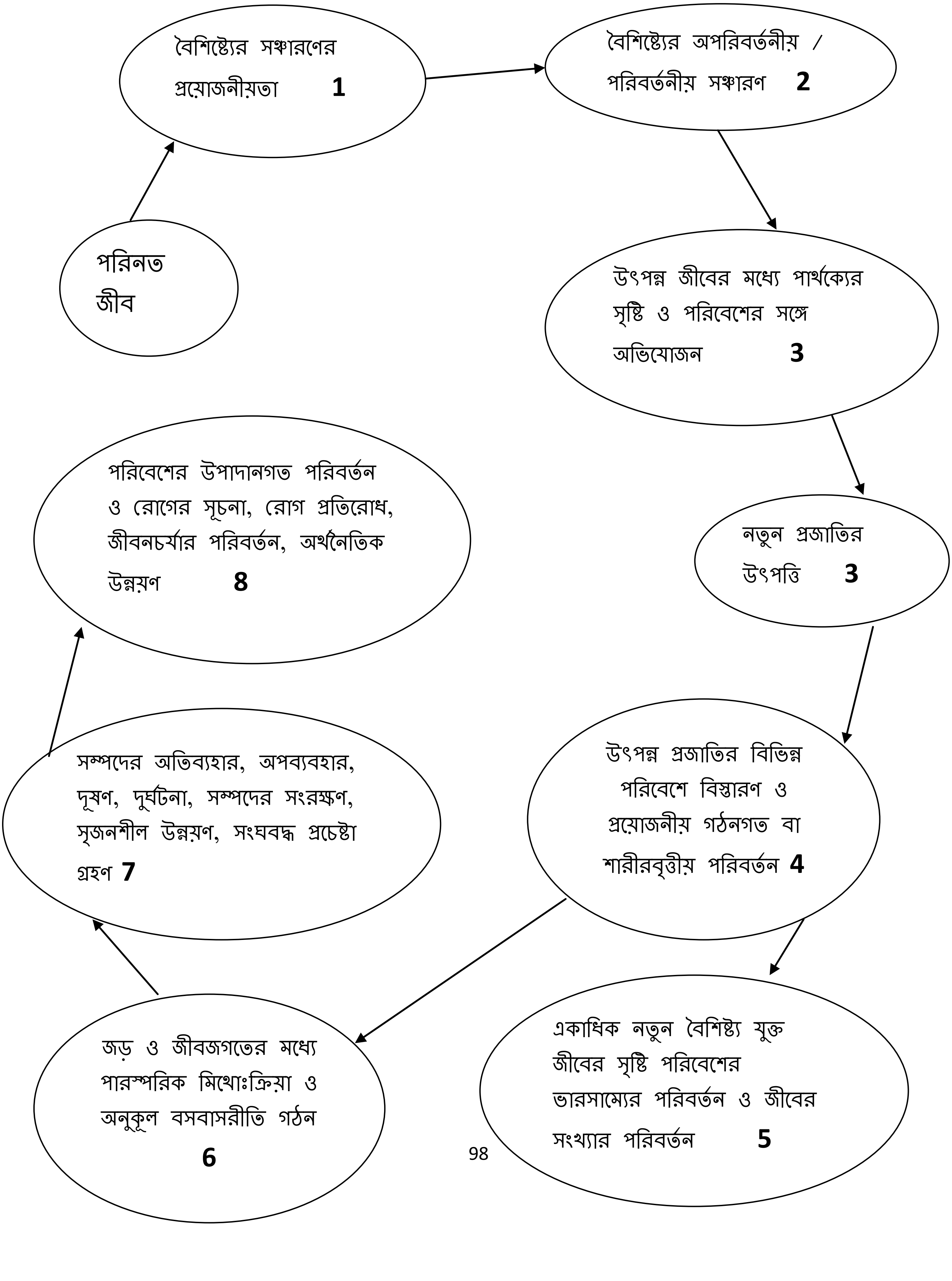
পরিনত জীব
বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণের প্রয়োজনীয়তা 1
বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয় / পরিবর্তনীয় সঞ্চারণ 2
উৎপন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি ও পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন 3
নতুন প্রজাতির উৎপত্তি 3
উৎপন্ন প্রজাতির বিভিন্ন পরিবেশে বিস্তারণ ও প্রয়োজনীয় গঠনগত বা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন 4
একাধিক নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত জীবের সৃষ্টি পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তন ও জীবের সংখ্যার পরিবর্তন 5
জড় ও জীবজগতের মধ্যে পারস্পরিক মিথোঃক্রিয়া ও অনুকূল বসবাসরীতি গঠন 6
সম্পদের অতিব্যহার, অপব্যবহার, দূষণ, দুর্ঘটনা, সম্পদের সংরক্ষণ, সৃজনশীল উন্নয়ণ, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ 7
পরিবেশের উপাদানগত পরিবর্তন ও রোগের সূচনা, রোগ প্রতিরোধ, জীবনচর্যার পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নয়ণ 8

পাঠক্রম

পরিবেশ ও ভৌতবিজ্ঞান (নবম ও দশম শ্রেণি)

‘পরিবেশ ও ভৌটবিজ্ঞান’ অংশে জড় বস্তু সম্পর্কে পরিমানগত চর্চার ভূমিকা হিসাবে এই পর্যায়ে পাঠক্রম গড়ে তোলা হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ জড় বিজ্ঞানের চর্চায় নানা পরীক্ষা ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে গণিতের সমন্বয়ে পদার্থের ধর্ম বিষয়ে তত্ত্ব গড়ে নবম শ্রেণি পর্যন্ত যে ভাবে শিক্ষার্থী শিখেছে তা হল সাধারণভাবে জড় পদার্থগুলো সে যেভাবে দেখতে পায় তার ভিত্তিতে। এখকানে যেসব ধর্ম ফুটে উঠে সেগুলিই সে গুণগতভাবে বোঝার চেষ্টা করে। এই অবস্থা থেকে তাকে ভবিষ্যৎ শিক্ষার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ সূত্রের দুটি ধাপ প্রথমটি মাধ্যমিক পর্যায়ে ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ শিক্ষা আর দ্বিতীয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা ইত্যাদি পাঠ ও শিখন। তাদের এতদেনের ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ শিক্ষার জ্ঞান থেকে নতুন জ্ঞান গঠন করাটাই এখন কার কাজ।

পরিমান গত ধারণা উন্নত করার জন্য এবার তারা কিছু বিষয়ে পরিমাপ করবে। বিজ্ঞানের খুব সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলির উল্লেখ ও সেগুলি নিয়ে কিছু গাণিতিক হিসাবও এ করতে পারবে।

পরিবেশের বহু বিষয়ের উপলব্ধিতে ও পরিবেশ সচেতন জীবনচর্চা গঠনে পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র ও রসায়নে বিভিন্ন ধারণা খুব কাজে লাগে। এ সব বিষয়ে সচেতন থেকে এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। এই পাঠসূচিতে আলোর ধর্ম, লেন্সের বৈশিষ্ট্য, বর্ণালী গতি সৃষ্টির ধারণা, মহাবিশ্বে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন রাশির ধারণা, ঘর্ষণের ধারণা, গৃহীত ও বর্জিত তাপ সংক্রান্ত সমস্যা পৃথিবীর চুম্বকত্ব, শব্দের প্রতিফলনের প্রয়োগ চাপ ঘাত সম্পর্কে ধারণা এবং এর নিম্নচাপ, ঝড়ের সম্পর্ক, মৌলের পারমানবিক গঠন, পর্যায় সারণি, রাসায়নিক বন্ধন, দ্রবণ, জল, মাটি, যন্ত্রের ব্যবহার, চিরাচরিত ও অচিরাচরিত শক্তির উৎস, অ্যাসিড-ক্ষার, ধাতু ও অধাতু, শিল্পগতভাবে গুরুত্ব রাসায়নিক পদার্থ, কার্বণের বিভিন্ন সাম্ভাবনাময় যৌগ, জৈব পরিমার, শিল্পজাত দ্রব্য ও দূষণের ন্যায় বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমান আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি পরিবর্তন, শিল্পভাবনা, রোগ নিরাময়ে ও নির্ণয়ে বিভিন্ন যৌগের ব্যবহার, পরিবেশ দূষণের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক, ফসল উৎপাদন ও মৃত্তিকার গুণাগুণির সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ থেকে কীভাবে উপরোক্ত পাঠগুলির ধারণাগত ভিত্তি তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে পারস্পরিক সংযোগ ও কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি ভৌতবিজ্ঞান পাঠের জীবিকামুখী সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করার সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে কণাগবেষণা, তরঙ্গ গবেষণা, শক্তির ব্যবহার, সম্ভাবনাময় যৌগের কৃত্রিম সংশ্লেষের ন্যায় বিষয়গুলি সম্পর্কেও পাঠ্যসূচির বিভিন্ন অংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠক্রম

ইতিহাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক] শিশুর ইতিহাস বোধকে পরিবেশ ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।

খ]প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যা কিছু শিশু দেখছে তারও যে একটা অতীত আছে এই ভাবনাটি সামনে রেখে শিশুর পরিবার,আশেপাশের পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের অদূর অতীত সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা।

গ] অতীতের যে কোন গল্প ও ঐতিহাসিক কাহিনিকে বর্তমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করা এবং শিশুর মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলা।

ঘ] সমাজে বাহ্যতঃ দেখা যায় যে সমস্ত অসাম্যের চিত্র,নিরপেক্ষতার পরিবেশ বা বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে পার্থক্য,সে সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা।

ঙ] সহমর্মিতা,বিভিন্নতাকে সম্মান জানানো,অতীতকে শ্রদ্ধা করা ও সম্মান জানানো,অতীতের ঘটনা বা গল্প নিয়ে নিজের “সংগ্রহ পুস্তিকা” নির্মাণ করা ইত্যাদি কৃত্যালির মাধ্যমে শিশুকে মূল্যবোধের শিক্ষায় দীক্ষিত করা।

চ]প্রতিটি গ্রাম ও এলাকায় কোন না কোন প্রাচীনতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা আবিষ্কার করার ব্যবস্থা করা,প্রাচীন মন্দির, মসজিদ বা পুরনো জমিদার বাড়িসহ মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা পুরনো মুদ্রা,পুস্তক বা ছবির নমুনা সংগ্রহ করা এবং এবিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

এখানে “পরিবেশ পরিচিতি” বিষয়টির মধ্যে কয়েকটি থিমে[theme] ইতিহাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু দেওয়া আছে।তবে সেক্ষেত্রে এর পঠন-পাঠনটি হবে কৃত্যালি নির্ভর। তাই শিশুর উপর বিষয় ব স্তু এবং তথ্যের চাপ হবে না। ভূগোল এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে এগুলি শেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইতিহাস উচ্চ-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

ক] যুগ ও কালের ধারণায় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বুঝতে পারা,তার বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করতে পারা

খ] বিভিন্ন যুগে সভ্যতার অগ্রগতি কয়েকটি থিমের [theme] মাধ্যমে বুঝতে পারা।পুঙ্খাণুপুঙ্খ তথ্যের মধ্যে না গিয়ে এই অগ্রগতির সার্বিক ধারণা জেনে নেওয়া।

গ] ঐতিহাসিকরা যেভাবে ইতিহাসকে জানতে পারেন সেই পথেই সংশ্লিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা এবং যুগের বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক,অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে পারা।

ঘ] পরিবেশ বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে জানা।একটি নির্দিষ্ট যুগের রাজা হওয়ার কাহিনি যে বড় কথা নয় সে তা বোঝা এবং যুগের মানুষের সামগ্রিক অবস্থা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বুঝতে পারা ও বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারা।

ঙ]ভারতের বৈচিত্রের মধ্যের ঐক্যের সুরটিকে ধরার চেষ্টা করা। ভৌগোলিক পার্থক্য,ধর্ম,বর্ণ,জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্য থাকা সত্তেও ভারত যে এক সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ভাবে বোঝা।

চ] রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটানো এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী নীতি ও তত্ব সমূহ, বুঝতে পারা এবং দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা সর্বোপরি সমকালীন প্রেক্ষাপটে এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা।

ছ] ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত ও বর্তমানকে দেখা এবং একটি সমাজের বা পৃথিবীর স্বপ্ন ভাবনায় আনা যা আগামী দিনে তা সমস্ত কাজের মধ্যেই প্রতিফলিত করতে পারা।

ঝ) তথ্যের বোঝা কমিয়ে, সামগ্রিক রূপরেখা প্রদান করে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মূলক কৃত্যালির মাধ্যমে ইতিহাসকে অনুমান করে জেনে নেওয়া এবং বর্তমান ভবিষতের অঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা।

ঞ] ধারাবাহিকভাবে যুগ অনুসরণ না করে বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে দেশ এবং বিদেশের ইতিহাসে কয়েকটি থিমে ভাগ করা এবং শিশুর কাছে উপস্থাপন করা।

পাঠক্রম

ভূগোল

- N.C.F-2005 এর নির্দেশ ও ভাবনা অনুসারে 'ভারমুক্ত ও আনন্দপূর্ণ' এবং অর্থবহ শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্যে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক ও বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত করে প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক বিষয় সমূহের জ্ঞানকে 'জানা' থেকে 'অজানার' স্তরে উন্মোচিত করার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বর্তমান পাঠক্রমে উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়টিকে সুদূর প্রসারিত, <u>ক্রমবর্ধমান</u>, <u>যুগোপযোগী</u> এবং

<u>সমাজবিজ্ঞান</u> ও <u>প্রকৃতি বিজ্ঞানের</u> <u>সমাহারে</u> একটি 'সাংশ্লেষিক' <u>বিষয়</u> হিসাবে গন্য করে এই স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিক ও বৌদ্ধিক স্তরের মানোপযোগী পাঠক্রম তৈরী করার প্রয়াস করা হয়েছে।

- অতীতে উচ্চ প্রাথমিক,মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়ে যে পা ঠক্রম ছিল তাতে বেশ কিছু জায়গায় বিষয়ের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল, যেমন ষষ্ঠ শ্রেণিতে সৌরজগত,সূর্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য মৌলিক তথ্যের সঙ্গে উপগ্রহ চাঁদের কথা দিয়ে বিষয়টি শুরু হয়েছে। বর্তমানে ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে এই পরিচ্ছদের আগে পূর্বসূত্র হিসাবে মহা বিশ্বের সৃষ্টি নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।
- প্রচলিত পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক [inter-relation]-এর অভাব কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে। বর্তমান পাঠক্রমে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও করা হয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ ভারত ও বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে।
- প্রচলিত পাঠক্রমে কৃত্যালির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ছিলনা । নবনির্মিত এই পাঠক্রম নতুন আঙ্গিকে ভাবা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বিষয়েই বিভিন্ন কৃত্যালি [activity] রাখা হয়েছে, যাতে পাঠক্রমটি 'বই কন্দ্রিক' না হয়ে 'কর্মকেন্দ্রিক' (Activity based) হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-যেমন দূ র্যোগকবলিত জায়গার ওপর সমীক্ষা, বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম/ ওয়ার্ডের আর্থসামাজিক অবস্থার সমীক্ষা ইত্যাদি।
- প্রচলিত পাঠক্রমে বিষয়ের উদাহরণ গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিচিতি ছিল, নবনির্মিত পাঠক্রমে এই অসুবিধা দূর করে, যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায়, স্থানীয় ও দেশীয় পরিচিত উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- প্রচলিত পাঠক্রমের পাঠ্যপুস্তকে শুধু বিষয়ের একঘেয়েমি ছিল এটা নয়, ছবিও প্রায় একইরকমের আকর্ষনহীন ছিল। বর্তমান নতুন পাঠক্রমে রঙিন ও চিত্তাকর্ষক ছবির সাহায্যে পুস্তক নির্মানে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের চিত্র কোলাজের মত করে পুস্তকে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।
- 'পরিবেশ' যে ভূগোলের অর্ন্তনিহিত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত পাঠক্রমে প্রায় দেখা যায় না। কেবলমাত্র অষ্টম শ্রেণীতে 'পরিবেশের ধারণা' এবং নবম শ্রেনীতে 'পরিবেশ দূষন' অর্ন্তভুক্ত রয়েছে নতুন পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয়ে গুরুত্বসহকারে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে এবং প্রতিটি শ্রেনিতে পরিবেশ সংক্রান্ত বি ষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং বিষয়গুলির মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন করা হয়েছে । যেমন-পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশের ধারণা, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ও সপ্তম শ্রেণিতে পরিবেশ দূষন, অষ্টম শ্রেণিতে পরিবেশের অবনমন, নবম শেনীতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও তার মোকাবিলা দশম শ্রেণীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- প্রচলিত পাঠক্রমে যুগোপযোগী আধুনিক ভৌগোলিক বিষয় ও তথ্যের উপস্থাপন প্রায় অনুপস্থিত। নতুন এই পাঠক্রমে নতুন নতুন কিছু ভৌ গোলিক ধারণা সংযোজন করা হয়েছে। যেমন-উপগ্রহচিত্র, প্রয়োজনীয়তা, বর্জ্যব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই নতুন বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীদিনে ভূগোলের উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী করে তুলবে এবং বিষয় হিসাবে 'ভূগোল' পঠন আরো আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে।
- নতুন পাঠক্রম নির্মাণের ভাবনায় ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূগোলের প্রতিটি শ্রেণির প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে এছাড়াও সমগ্র পাঠক্রমে ও পাঠসূচিতে স্বাধীন চিন্তাভাবনা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে।
- উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়ে অনেক পাঠ্যসূচী একাধিকবার বিভিন্ন শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির ফলে, পাঠ্যসূচীর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে । যেমন-পৃথিবীর গতি বর্তমানে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে আছে। নতুন পাঠক্রমে যথাসম্ভব পুনারাবৃত্তি বাদ দিয়ে পাঠ্য সূচী তৈরী করা হয়েছে এতে পাঠক্রমে কলেবর হ্রাস পেয়েছে । যেহেতু কৃত্যালির মাধ্যমে শিখনক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তাই নির্দিষ্ট শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞান সম্পূর্ন হবে আশা করা যায়।

- প্রচলিত পাঠক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমান পাঠক্রমে নতুন আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে, কোন কোন পাঠ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পড়ানো খুব প্রয়োজন । শিখন পদ্ধতিতে ICT (Information Communication Technology) এবং CAL (Computer aided learning) এর প্রয়োগের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠগুলিকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে শ্রেণিকক্ষে CAL এর প্রয়োগ ব্যাপকভাবে হতে পারে।

পাঠক্রম

সংস্কৃতি স্বাস্থ্য শারীর শিক্ষা (প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক)

[সঙ্গীত, অভিনয়, অঙ্কন, জনসংযোগ, খেলা ধূলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য, সমাজ কর্তব্য ইত্যাদি]

সব পাঠক্রমের মূলকথা হল মান্য সামর্থ্য অর্জন। 'মান্য' বলতে সভ্যতার অগ্রগতির সাপেক্ষ বোঝায়। দেহ মন চেতনার সঙ্গে মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নের নিবিড় যোগ । কার্য-কারণ সম্বন্ধসূত্রে জড়ানো । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রমোন্নতির গাতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেহ-মন-চেতনার বিকাশ ঘটানো আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই লক্ষে বর্তমান পাঠক্রমটি তৈরি করা হয়েছে। যাতে বিদ্যার্থী নিজের জীবনের সুরটি জগতের তারে বেঁধে নিতে পারে।

কিন্তু পাঠক্রমের তত্ব-আদর্শ যখন বিদ্যার্থীর আনন্দময় জীবনে বোঝাই করা কলসি-হাঁড়ির ঝাঁকায় পরিণত হয়, তখনি সমস্ত উদ্দেশ্য ক্লান্তির স্বেদ হয়ে ঝরে পড়ে। একথা মাথায় রেখে বিগত পাঠক্রমের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে বর্তমান পাঠক্রমটি নির্মান হয়েছে। যার প্রতিটি বিষয়ই সামর্থ্য নির্ভর অংশগ্রহণ মুলক শিখনের অভিমুখ উন্মুক্ত করছে।

শিখনে যত বিষয়ই থাকুক না কেন কোনোটিই বিদ্যার্থীর শরীর সাস্থ্য সংস্কৃতি আনন্দময় বিনোদন বাদ হতে পারে না। এইজন্য দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিগত পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও বর্তমান পাঠক্রমে তার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা হল।

প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দময় জীবনই শিশুর জীবন । খেলাধূলাই তার ভিত্তি। দেহমনের সুসংবদ্ধ বৃদ্ধি-বিকাশ ঘটে খেলার মাধ্যমে।আবার সুস্থ জীবন জাপনের জন্যে সাস্থ্যবিষয়ক সু-অভ্যাস তার দেহ ও মনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।দেহ ও মনের সঙ্গে তার চেতনার ঐকান্তিক যোগ।এবং একই সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বিচিত্র কর্মকাণ্ড।রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মনের জীবনের নাম সংস্কৃতি'।সেইজন্য একই বৃন্তের মধ্যে সংস্কৃতি স্বাস্থ্য শরীরশিক্ষা খেলাধুলো নামের পাপড়ি গেঁথে গঠন করা হল সম্পূর্ন বিষয়টি ।পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত,অভিনয়,অঙ্কন ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত করা হল।স্বাধীন ভাবে মনের আনন্দে সে ক্রিয়াত্মক এবং সৃজনাত্মক কর্মকাণ্ড গুলো করার দীর্ঘ অবসর পাবে।সুযোগ থাকবে আত্মচিন্তা চেতনার বিকাশের।তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ এর দুয়ার খুলে এসে দাঁড়াতে পারবে 'বিশ্বলোকের অঙ্গনে।

সংস্কৃতি স্বাস্থ্য শারীর শিক্ষা খেলাধুলো-সম্পৃক্ত বিষয় প্রধান রুপলেখা বা উদ্দেশ্য এইভাবে উল্লেখ করা যায়-

- ✓ এই বিষয়ক কর্মকান্ড দুই ধারায় বিন্যস্ত্য ।সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার মান ৫০ এবং স্বাস্থ্য শরীর শিক্ষা খেলাধূলার মান ৫০।
- ✓ প্রথম ধারায় থাকছে সঙ্গীত,অভিনয়,অঙ্কন এবং জনসংযোগ;দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খেলা,শরীর চর্চা,স্বাস্থ্যচর্চা এবং স্মাজকর্তব্য।

ক) সঙ্গীত, অভিনয়, অঙ্কন জনসংযোগ

- ✓ ভাষা-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজ-ঐতিহ্যের সঙ্গে এর যোগ-বন্ধন ঘটান
- ✓ প্রকৃতি পরিবেশ মানুষ জীব সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যার্থি কৌতুহলকে সজীব ও লালন-পালন করায় আগ্রহী করা।
- ✓ শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে তরান্বিত করা যাতে অন্যান্য বিষয় শিখনে তার উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগরুক করা।
- ✓ হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও চর্চার সমকালীন হয়ে ফিরিয়ে আনানো।
- ✓ বিদ্যার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও নেতৃত্বদান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সহ মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- ✓ বিদ্যার্থীর সৃজন ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।
- ✓ পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিদ্যার্থীর সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়ে উঠবে।
- ✓ ভবিষৎ জীবনে কর্মের/বৃত্তির ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হয়ে উঠবে।
- ✓ রোগ ও তার নিয়ন্ত্রন এবং সেই সংক্রান্ত সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা।
- ✓ নিরাপত্তা ও সেবার মনোভাব জাগ্রত করা
- ✓ প্রকৃতি ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপযোগ বিদ্যার্থীর মধ্যে তৈরি করা।
- ✓ অভ্যাস,অনুশীলন,অধ্যাবসায়-এসবের উপযোগ বিদ্যার্থীর মধ্যে জাগ্রত করা।

খ) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ১৯৭৪ সালে পাঠক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চাকে অতিরিক্ত পাঠক্রমিক বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়। পরে এটি সহ পাঠক্রমিক বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিষয় প্রাপ্ত নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হত। কিন্তু ১৯৯৫ সালে এটি মাধ্যমিক পাঠক্রম থেকে বাদ পড়ে। এখন পর্যন্ত এটি সহ পাঠক্রমিক কৃত্যালি হিসেবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হয়েছে। প্রাথমিকে ১৯৮১ সালের নতুন পাঠক্রমে এটিকে কর্মসূচির সঙ্গে সুসংঘত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়টি বাদ পড়ায় উচ্চপ্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে এই কৃত্যালিগুলির অ্যাকাডেমিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে।

বর্তমান সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেছে এবং সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রচলন করার সুপারিশ করেছেন। তাই এই বিষয়ে পাঠক্রমের রূপরেখাটি হল নিম্নরূপ :

- ✓ বিষয়টিকে কমিটি সহ পাঠক্রমিক হিসেবে না দেখে একটি পাঠক্রমিক বিষয় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাই উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এ বিষয়টি পাঠ ও চর্চা গুরুত্ব সহকারে করার সুপারিশ করেছেন। বিষয়টির মধ্যে ৬০ ভাগ কৃত্যালি এবং ৪০ ভাগ পঠন-পাঠন বিষয়ক কাজ যুক্ত হবে। স

- ✓ এই বিষয়ের কৃত্যালিগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে স্বশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব, সৌন্দর্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুণাবলির চর্চা করা যাবে।
- ✓ এই বিষয় শিশুকে বিভিন্ন বিপদের সময় তাৎক্ষনিক সক্রিয়তার পন্থাগুলি শেখাতে পারবে এবং বিভিন্ন রোগ এবং মহামারীর সময়ে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে।
- ✓ শিশুকে মানসিক ভাবে সব অসাফল্য ও দুঃখ জয় করতে সাহায্য করবে।
- ✓ বালক/বালিকাদের মধ্যে সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্যে করবে।
- ✓ শারীরিক দক্ষতা এবং সুস্থতা তুলতে এই বিষয় সাহায্যে করবে।
- ✓ মাধ্যমিক পরীক্ষার অত্যাধিক চাপ হ্রাস করে শিশুকে তার নিজের দক্ষতা অনুযায়ী সামর্থ্য প্রদর্শনে সাহায্য করবে।
- ✓ পরবর্তীকালে যারা ক্রীড়া ও খেলা-ধুলো নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় যেতে চায় তারাও এই বিষয় থেকে অনেকাংশ সাহায্য পেতে পারবে।
- ✓ মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ছুটের হার কমাতে এই বিষয়টি অনেকাংশে সাহায্য করতে পারবে।

Anexure - I

Note of Dissent

By Sunanda Sanyal

I do not subscribe to the view taken by most other members of the School Expert Committee on the "No-Detention Policy up to Class VIII". Hence this Note of Dissent!

1. **It has been argued that we have enough resources, yetwe cannot get off to a start in compulsory schoolingbecause wedo not ensureautomatic promotion to the next higher class up to Class VIII. On the contrary, I believe weshould wait till Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) looks like succeeding.The CCE is indeed child-friendly. To be sure, the RTE Act tells us that failure can never be blamed on the child. He/she is capable of at least the minimum level of learning. The teacher concerned may have failed, the headmaster probably, the school certainly – but the child never ever. But, as one of our colleagues has said, it is „hugely different'.**
2. **I agree with him. But the teacher, the headmaster and the school as a whole must accept the new challenge, because responsibility is networked. It does not spare those who will take steps either. For this the whole school system has to change itsmindset. Naturally, this takes time.The model of partisanship followed by the previous government has not worked. We should not allow the nation to conclude that the CCE will never take shape in this country.The elimination of examinations up to Class VIII is an instance in point.**
3. **Nettled by a political opponent, the LF government, having eliminated the term-end examination up to Class IV,attempted an external examination at the end of Class II.But the West Bengal Board of Primary Education could not publish its results under the LF rule. In other words, nobody knew what happened to their answer scripts, that is,how the children fared.Nor did the teachers concerned get to know how effectively they had taught. This showshow difficult it is to reconstructthe base of examinations once it has been ruined.**
4. **On top of it, wehave had the experience of suspension of English teaching up to Class V by the previous government.Nineteen years later, when the past governmenttried to reintroduce it found the proposition much too difficult.**
5. **Why don't welearn from the mistakes made by the previous government and put in place aninfrastructure first for the CCE to work? In our hot haste we are risking the future of the CCE itself. We know what is going to happen. Some of the private English-medium schools, to which the political leaders in general send their children, will carry on the CCE with admirable results, while Bengali-medium schools in the districts will suffer.**

6. **I accept in principle that no child should fail in Class I,and far fewer in Class VIII, or in any class for that matter, having achieved the minimum level of learning. But there are too many slips between the cup and the lip.I believe we are risking the future of the new government by basing our recommendation on a very unpopular decision.**
7. **I think in an exam-bound society,the formal teaching-learning system should familiarise the children with examinations, which he/she will have to encounter, anyway. We should instead let them discover that exams are by no means fearsome.**
8. **Therefore, we should use the time,before and after, 2016 by convincing the MPs of an appropriate amendment to the Act. Mind you,more than 50 per cent children in West Bengal drop out in Class II. These therefore will drop out without facing any examination.**
9. **Besides, the fear of „failure' is based on the suspicion that the RTE won't succeed. Someone has said the „pass-fail' is an invitation to suicide. But those who commit suicide are mental patients, and should be treated as such. Come crop failure, he/she will commit suicide.**
10. **But like education, examinations also can be made joyful for those who have studied for even the minimum level of learning. For one thing, less than 1 per cent children commit suicide for fear of, or on account of, failure. Besides, some children do enjoy taking an examination.**
11. **Look at the range of things that has to be accomplished before I hope the RTE will succeed in its main aim:**
    - **(a) bring down teacher-pupil ratio to 1:35(which is now anything up to 200)**
    - **(b) set up schools that haveat least one teacher per class**
    - **(c) make elaborate arrangement for teacher training**
    - **(d) design new courses for teacher training with the NCF in mind,which is „hugely new', I repeat, according to a colleague.**

How difficult isit to foundmore schools? PadmanidhiDhar,a CPI-M MLA in the 12thVidhanSabha (the current one is 15th), headed aStanding Committee related to schools, sports etc. He said in his Report, „Wecannot possibly set up the schools required, for which we can't even acquire the land (before many years pass).' The same goes for teacher training, toilets, reservation for SC/ST and so on. #

Anexure - II

To

The Chairman

Expert Committee for School Committee

West Bengal

Sub: **Examination and Pass –Fail issue** [class VI-VIII and class IX-X]

Dear Sir

I am sorry; I could not attend the crucial meetings to discuss the above issues. However, I would like to propose the following in regard to examination and Pass-Fail issue in schools:

1. Examinations:

(a) Two times yearly examinations, i.e. Half-Yearly and Annual examination should be held in each class (like it was practised earlier). Such examinations are essential.

(b) Class teachers may also arrange to take casual weekly or fortnightly tests of regular progress of students.

It is important that Half-Yearly as well as Annual examinations will help the students to evaluate their academic standard in the class. Even regular weekly or fortnightly casual tasks also will help the students to motivate them to rectify their drawbacks.

It is my strong opinion that students should have the courage to sit for examinations. Since they will have to face numerous examinations and tests in their future lives, We cannot encourage them to become idle if they want to success in life. They should not consider examinations a as burden but should think it as an occasion to prove their proficiency and skill instead.

However, I think that the course of study/syllabus should be trimmed and made lucid, and unnecessary burden should be removed keeping the essential portions of study more attractive.(In fact, the syllabus coupled with bad teaching could be a burden, not the examination.)

We all know that during the last couple of decades the education system including class attendance, class disciplines, over all academic activities in schools have come down to it's lowest level. At this juncture when the academic situation is quiet chaotic and disorganised, discontinuation of examination will encourage the prevailing negative trends i.e. schools. In fact we need to bring back strict disciplines in every sphere of academic activities including examinations in schools.

So I strongly suggest that school should have regular examinations as I have mentioned above. I am afraid; liberty of non-examination will on that part of students as well as the teachers will loosen the discipline of class & quality of education and bring down the academic standard of school education in West Bengal.

<u>Pass-fail in classes:-</u>

a) A special format of mark-sheets need to be prepared where there will be no mention of Pass or Fail but only number or grade obtained by the students.
b) Students who get more than 34% or standard grades will automatically will go to the next class. The students who get less than that will have to meet the Principal and class teacher along with his parents/guardian to discuss and to take decision in regard to students option to stay back or to sit in the next class. In the decision making students role and important and major.
   <u>This process will continue from class VI to VIII only.</u>

From class IX to XII Pass & Fail will be determined by the school authority and as per the academic standard of students.

There will be no Pass-Fail for students of class-I to class-V. However regular class tests will be taken by the teachers. Students of class-IV & V may have also annual examinations.

With best regards,
Sincerely,
Jogen Choudhury ,
Member Expert Committee

বিষয় ভিত্তিক

পাঠ্যসূচি

(খসড়া)